প্রকাশক :
প্রেমময় মজুমদার
৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা (১১ই জুলাই, ১৯৫৪)

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বোস রোড
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

বেঁধেছেন :
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নিবেদন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পুরাতন বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি। অনেকেই বলবেন আখ্যানকাব্যে একতম। বর্তমান পুস্তকে তাঁর কবিব্যক্তিত্ব এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শিল্পমূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। পূর্বসূরীরা নানা প্রসঙ্গে কবি সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

মুকুন্দরামের মত সেকালের একজন বড় কবিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থে রাখবার কিছু মূল্য আছে।

আমাদের উত্তরাধিকারের কিছু কিছু সূত্র মুকুন্দরামে মিলবে। সে দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।

বন্ধুবর শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার এবং শ্রীচিন্ময় মজুমদার মুদ্রণ-প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্ষেত্র গুপ্ত

আমার শিক্ষাগুরু

ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

[বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগীয় প্রধান]

শ্রীচরণেষু

প্রথম অধ্যায়

এক ॥ মুখবন্ধ ॥

মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই একালের সাহিত্যবোধকে স্পর্শ করেছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকেরই আছে। ঐতিহ্যের মূল্যও স্বীকার্য। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানসঞ্চয় আর সাহিত্যিক রসচর্চায় চিত্তকে সরস করা ঠিক এক নয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা এক আর তাকে যথার্থ উপভোগ করা অন্য বস্তু। কিন্তু এই উপভোগের বিচারেই কোনো রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষের শেষ কথা।

আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে মধ্যযুগের সাহিত্য বিবর্ণ এবং অপরিচয়ের দূরত্বে অনাত্মীয়। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা বিরাজ করুন, আস্বাদের বন্ধ দরজা রইল অনড়।

আজকের মানুষ ভাষার ব্যবধান ডিঙিয়ে একেবারে মানচিত্রের স্বতন্ত্র কোটিতে, বিপরীত বর্ণে অভিযান করছে সাহিত্যের স্বাদুতার লোভে। দেশে এবং কালে বহুদূরব্যাপ্ত তার এই উৎসাহ। আমাদের দেশও এ উৎসবের অংশীদার। আনন্দের এই মহাভোজ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে শুধু তার নিজের ভাষার পুরাতন সাহিত্যের সঞ্চয়।

বাধা অনেক আছে। কিন্তু সাহিত্যচর্চার পৌরোহিত্য যাঁরা গ্রহণ করেছেন, বাঁধ ভাঙবার বল যোগাবার দায়িত্ব তাঁদেরও। অর্থাৎ পাঠকদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সমালোচকেরা তফাৎ থাকতে পারেন না।

সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণার প্রসার ঘটুক। তাত্ত্বিক আলোচনা আরও প্রাণবন্ত হোক, বহু বিশ্লেষণে উঠুক স্পষ্ট হয়ে। কিন্তু এই দুই ধারার পাশে তৃতীয় একটি ধারাকেও স্থান দিতে হবে। সে স্থানটিও যেন স্বাধীনতার মর্যাদা পায়। মধ্যযুগের সাহিত্য-সৌন্দর্যের আলোচনা যেন অপর দুই ধারার অবহেলিত পরিশিষ্টমাত্র না হয়ে থাকে।

মঙ্গলকাব্যের বিবর্ণপ্রায় শাখাটির কথা প্রথমেই মনে পড়বে। নানা রচনা কাহিনীতে, কথায় আর ভঙ্গিতে একেবারে একাকার। ব্যক্তিকে চেনা যায় না, রচনার শিল্পগুণকে স্বতন্ত্র করে বুঝে নেওয়া হয়ে পড়ে অসম্ভব। তবুও এমন শিল্পী আছেন যাঁদের লেখা চিনে নিলে পরিশ্রম বৃথা যাবে না। চারধারের অনেক আগাছা সরিয়ে কঠিনের সাধনায় সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু রসের মূল্যে কঠিন পুরস্কার দেবেন।

মুকুন্দরাম এমনি এক ব্যক্তিত্ব, এক শিল্পী ॥

দুই ॥ ঐতিহ্য বনাম ব্যক্তিত্ব ॥

মুকুন্দরাম মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। চণ্ডীমঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের কবিরা কতগুলি প্যাটার্নের বাঁধাধরা পথে চলেন। কোনো সুসম্বদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও এটা মঙ্গলকবিদের অবশ্য অনুসরণীয় সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কোনো সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিপদ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু বিদ্রোহ কেউ করেন নি। ভারতচন্দ্রের মত কেউ কেউ একে মেনে নিয়ে অন্তরে অন্তরে ক্লিষ্ট হয়েছেন। মুকুন্দরামে সে ক্লিষ্টতা নেই, বিরূপতাও নেই। গতানুগতিক প্রসন্ন স্বীকৃতি আছে। নতি জানিয়েও তিনি আত্মার ঔজ্জ্বল্যে উচ্চশির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ আছে। আরও বিশেষ করে আছে চণ্ডীমঙ্গলের নিজস্ব কাহিনী ও চরিত্রধারা। সেখানেও কবি স্রোতের বিপরীতে উজান বাইতে পারেন না। সম্ভবত চানও না। মধ্যযুগে মানুষের এবং কবিদেরও মনের গঠন এমনই ছিল। মূল কাহিনী পরিকল্পনার কৃতিত্ব কবির নেই, সে-কাহিনী ঐতিহ্যবাহিত। প্রধান চরিত্রগুলিও পূর্বলালিত। একটি পুরাতন কাহিনী, কতকগুলি পূর্বকল্পিত চরিত্র এবং একান্ত সুনির্দিষ্ট কাব্যগঠন রীতি। এই উপকরণ। উপকরণ বলা যায় আবার শৃঙ্খলও। মুকুন্দরাম

এই শিকল বাজিয়ে সুর তুলেছেন। ভারতচন্দ্রে হাতের শিকলে টান পড়েছে, অন্তরাত্মা ব্যথিয়ে উঠেছে ॥

তিন ॥ কবিজীবনী ॥

মুকুন্দরামের এই স্বাতন্ত্র্য অনুসরণযোগ্য। কোথায় এই স্বাতন্ত্র্য? কবির জীবনে অথবা জীবনাতীত আত্মায়?

কবির জীবনকথা সামান্য। উপকরণও বেশি নেই। কবির আত্মজীবনীটি এর প্রধান অবলম্বন। পণ্ডিতমহলে এ বিতর্ক কিছু আছে। সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয়ে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অসম্ভব। তবে ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচিত হয়েছিল এ সম্পর্কে মতভেদ নেই। সঠিক হিসেবে বছর কুড়ি-পঁচিশের গড়মিল হচ্ছে। কিন্তু তা ষোড়শ শতকের শেষ দিকের চতুর্থাংশের সীমাকে কোনো দিকেই ডিঙিয়ে যাচ্ছে না।

মুকুন্দরামের জন্ম হয়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে। সম্ভবত তৃতীয় দশকে। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম ছিল কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। দামুন্যার তালুকদার নন্দীদের জমিজমা পুরুষানুক্রমে চাষবাস করিয়ে মুকুন্দরামদের জীবিকা নির্বাহ হত।

পঞ্চোপাসক হিন্দুপরিবারের সন্তান মুকুন্দরাম। তবে বিশেষ করে শিবভক্ত ছিলেন তাঁরা। পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

সরল গ্রাম্য জীবন ধীর লয়ে বয়ে চলছিল। এমন সময়ে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বিপদ্‌পাত দামুন্যা গ্রামকে বিপর্যস্ত করে দিল। বহুকাল পরে কবি স্মৃতিচারণায় বল্‌ছেন —

কবি মুকুন্দরাম

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥

সম্ভবত কবির স্মৃতি ঐতিহাসিক কালজ্ঞান থেকে কিছু ভ্রষ্ট হয়েছে। মানসিংহ বঙ্গের সুবাদার থাকাকালে উক্ত মাৎস্যন্যায় দেখা দিলে ব্রাহ্মণভূমির রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা সম্ভব হত না। রঘুনাথ রায় তখন নিতান্তই বালক।

সে যাইই হোক মুকুন্দরামের যৌবনকালে মুসলমান রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে দামুন্যার জনজীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ এবং বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে কবির পর্যবেক্ষণ ও রচনাক্ষমতার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি আছে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মুদ্রাঙ্কন।

ডিহিদার-পোদ্দার-উজীরে মিলে শোষণে আর অত্যাচারে শ্মশান-বিভীষিকা সৃষ্টি করে তুলল। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে মুসলমান রাজশক্তির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে উঠল। জমির মাপ নেওয়া হল কোণে-কোণে দড়ি ধরে। পনের কাঠায় এক কুড়ার হিসেব লেখা হল। অনাবাদী জমিকে ধরা হল সুফলা বলে। ফলে খাজনা যা ধরা হল তা যেমন অন্যায্য, তেমনি প্রজার শক্তির অতীত। চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার। কর্মচারীদের ঘুষের হাত নির্লজ্জভাবে প্রসারিত হয়ে রইল; উপকার বর্তাল না কণামাত্র। সুযোগ বুঝে পোদ্দার বসাল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ধার দিতে গিয়ে দিনপ্রতি এক পাই সুদ তো রাখলই, টাকায় আড়াই আনা অকারণে কেটে নিতে লাগল। লোকজন ত্রাসে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হল। গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে লাগল ধান, গরু, সহায়, সম্বল জলের দরে বিক্রি করে। কিনবার লোক মেলা ভার হল। ক্ষেতেখামারে কাজ করবার মত দিনমজুরও রইল না দেশে।

খাজনার ভয়ে প্রজা পালায় দেখে প্রতি গৃহস্থের দরজায় পাইক বসানো হল। মুকুন্দরামের জমিদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হলেন। কবি এবারে বিশেষ আতঙ্কিত হলেন। গরীব খাঁয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় জন্মভূমি দামুন্যা ত্যাগ করলেন। সঙ্গে বয়স্ক পুরুষের মধ্যে অনুজ রামানন্দ এবং অনুচর দামোদর নন্দী। মধ্যপথে দস্যুসর্দার রূপরায় সঞ্চিত ধনসম্পত্তি কেড়ে নিল। সম্ভবত রামানন্দের বুদ্ধির ভুল এর জন্য কতকটা দায়ী ছিল। না হলে কবি লিখতেন না—

ভাই নহে উপযুক্ত রূপরায় নিল বিত্ত।

সম্বলহীন কবিকে নিজগৃহে আশ্রয় দিল যদু কুণ্ডু। তিন দিবসের আহার্যও দান করল। এর পরে কবি জলপথে গোড়াই নদী বেয়ে তেউট্যায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে দারুকেশ্বর নদী ধরে বাতনগিরিতে গেলেন। বাতনগিরির গঙ্গাদাস সম্বলহীন কবিকে নানাভাবে সাহায্য করল। অবশেষে দামোদর নদ হয়ে কুচুট নগরে উপস্থিত হলেন। কবির আর্থিক দুরবস্থা তখন চরমে পৌঁছেছে। স্নানের তৈল জোটে না, ভাতের জন্য শিশুপুত্রের কান্না থামাতে হয় জল দিয়ে।

ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে কাতর নিদ্রিত মুকুন্দরাম স্বপ্নে চণ্ডীর দেখা পেলেন, কাব্য লিখবার জন্য আদিষ্ট হলেন। অবশেষে শিলাই নদী ধরে চলতে চলতে আড়রা গ্রামে গিয়ে বিপন্মুক্ত হলেন। ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলের জমিদার। নাম বাঁকুড়া রায়। মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে দশ আড়া ধান পুরস্কার দিলেন এবং আপন পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। মুকুন্দরামের আর্থিক সমস্যা মিটল। অবশেষে তাঁর ছাত্র রঘুনাথ জমিদার হলেন। কিন্তু কাব্যরচনা আর হল না। অনুচর দামোদর নন্দী স্বপ্নের খবর রাখত। তার উৎসাহ প্রথমাবধিই ছিল। অবশেষে নরপতি রঘুনাথের অনুরোধে কবি কাব্যরচনা করলেন।

চার ॥ জীবনভাষ্য ॥

মুকুন্দরামের জীবনের তথ্য এইটুকুই মাত্র জানা গিয়েছে। ঘটনা খুবই সামান্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কবির জীবনবোধের কেন্দ্রে পৌঁছানো যায় কিনা তাই আমরা খুঁজে দেখব।

প্রথমত, মুকুন্দরামের জীবনে হয়তো আরও কিছু ঘটনা ছিল। কিন্তু তা পাওয়া যায় নি। কবি তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিনী বিবৃত করতে চান নি। গ্রন্থরচনার পূর্বকথা মাত্র ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে আরও কিছু ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। তবে সে তথ্য আমাদের হাতে নেই। প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ভালো। অবশ্য আমার বিশ্বাস মুকুন্দরামের জীবনে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। ঘটনাবিরলই তাঁর জীবন। রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক সঙ্কটে পড়ে দামুন্যা ত্যাগ, পথের বিপদ, নিষ্করুণ দারিদ্র্য, বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে রঘুনাথের অনুরোধে চণ্ডীমঙ্গল রচনা। মুকুন্দরামের জীবনের সর্বপ্রধান অভিজ্ঞতা দামুন্যার মাৎস্যন্যায় থেকে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়প্রাপ্তি পর্যন্ত। চণ্ডীমঙ্গল রচনাও কবির মনের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাহিরের ঘটনাবর্তে প্রবল তরঙ্গ ও উত্তেজনা এর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই প্রকাশযোগ্য কিছুই এর মধ্যে নেই। এক পংক্তিতেই কাব্যরচনার বিষয়টির উপরে ছেদ টানলেন। তাঁর কবিচিত্তের বিস্ফার হৃদয়াভ্যন্তরেই গুপ্ত রইল। সে-উপলব্ধি তাঁর একার, অপরে তার অংশীদার নয়। তাই সে-কথা কবির অন্তরেই গুঞ্জরিত হয়েছে, বাইরে প্রকাশ পায় নি। বাহির-অন্তর জুড়ে যে প্রবল ঘটনাসংক্ষোভ কবির একমাত্র অভিজ্ঞতার বস্তু তা হল এই মাৎস্যন্যায়ে জন্মভূমি-পরিত্যাগ। পরবর্তীকালে অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করলে কবি নিশ্চয়ই তাকে আত্মজীবনীমধ্যে উল্লেখ করতেন। উক্ত অভিজ্ঞতা যে কবিজীবনে একক এবং বিপুল প্রভাব বিস্তারে তাৎপর্যপূর্ণ তা বোঝা যায় দুটি

কারণে। এক॥ কবির আত্মজীবনী উক্ত ঘটনার বিবরণেই পূর্ণ। কবি অবশ্য এর নাম দিয়েছেন গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। কিন্তু চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের মত একটা প্রথানুগ কাল্পনিক ব্যাপারকে যে-কোনো প্রসঙ্গেই বিবৃত করা যেত। কবি আপন জীবনের একমাত্র এবং বিশেষ উত্তেজক অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে প্রকাশ করলেন। দুই॥ কবির কাব্যে এই ঘটনার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত প্রতিফলন পড়েছে বহুস্থানে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাড়িত কলিঙ্গ প্রজাদের দেশত্যাগ দামুন্যাবাসীদের গ্রাম ছেড়ে যাবার স্মৃতি ধরে রেখেছে। গুজরাটে কালকেতুর নগর-পত্তনে এমন একটি আদর্শ জনপদের কল্পনা করেছেন কবি যার ভূমি-ব্যবস্থায় ডিহিদারী অরাজকতা স্থান পাবে না। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলেছে—

আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি রয়ে বসে দিও কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে॥

কালকেতুর অত্যাচারে পশুদের ক্রন্দনের ভাষায়ও রাজকীয় অত্যাচারে পীড়িত ভূমিভিত্তিক মানুষের ক্রন্দন শ্রুত হয়েছে। কিন্তু এই তীব্র দিনগুলি কবির ব্যক্তিত্বকে গঠন করে নি। প্রবল ঘটনাতরঙ্গের প্রতি কোনোরূপ আকর্ষণ তিনি বোধ করেন নি, প্রচণ্ডের কেশর চেপে উল্লাসের বিপুলতাকে তিনি আকণ্ঠ পান করতে চান নি। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। ঘটনাবিরল জীবনের প্রাত্যহিকের মধ্যেই মুকুন্দরাম নিশ্চিন্ত থেকেছেন। পুরাতন বাঙালির জীবনযাত্রার যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

এই প্রসঙ্গে সেই কথা মনে পড়ে "বৃহত্তর, সংগ্রাম-মুখর, উল্লাস-উতরোল জীবনের স্পর্শও সেইজন্যই বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোনো বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই।···সেখানে জীবনের শান্ত, সংযত, সমতাল; পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা; সুবিস্তৃত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।" [—বাঙালীর ইতিহাস]।

অবশ্য ষোড়শ শতক জুড়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পাঠান-মোগলদের সংগ্রাম দীর্ঘকাল এবং বিস্তৃত স্থান জুড়ে চলেছে। তার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুকুন্দরাম লাভ করেছিলেন কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মেদিনীপুর- আরড়া গ্রামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে কোনো যুদ্ধক্ষেত্র রচিত হয়েছিল কিনা সে-তথ্য আমাদের হাতে নেই। অন্যথায় সেকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রশ্নই উঠে না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক বিপর্যয় একেবারে মাথার উপরে এসে না পড়লে মধ্যযুগের বাঙালি চঞ্চল হত না। মুকুন্দরাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মনে হয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কবির ছিল না। কারণ,—এক, যুদ্ধবর্ণনায় একান্ত অবাস্তব কল্পনাতিরেক; দুই, আত্মজীবনীতে এ জাতীয় উত্তেজক অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি।

সাধারণ বাঙালিজীবনে পরিবারকেন্দ্রিক নিত্যধর্মই মুকুন্দরামের জীবনে আচরিত।

দ্বিতীয়ত, মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায় গ্রাম্য জমিদার মাত্র ছিলেন। তাঁর 'নরপতি' অভিধা নেহাৎই গৌরবসূচক। সেখানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও জীবন-বেগ যেমন ছিল না, তেমনি ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বরও ছিল না। মুকুন্দরামের জীবনচর্চার অতি সাধারণ সামান্যতার সঙ্গে এই পৃষ্ঠপোষকতার সহজ সামঞ্জস্য আছে।

তৃতীয়ত, মুকুন্দরামের ধর্ম-বিশ্বাস কিছুটা আলোচনার বিষয়। মুকুন্দরামের জন্ম শৈব পরিবারে। কিন্তু তাঁর পিতামহ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

আবার মুকুন্দরাম শাক্ত দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য লিখলেন। মুকুন্দরামের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে এই কারণেই বিতর্ক আছে। এ সম্পর্কে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতই অনেকে মেনে নিয়েছেন, "It appears clear and transparent that Kabikankan Mukundaram Chakravarty was neither a Vaishnava, nor a Sakta, nor a Saiva, nor a Ganapatya : but he was everything. In other words, he was a believer of all the deities of the Smarta cult of medieval Bengal." তবে একথাও মনে হয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রতি কবির কিছু বেশি প্রবণতা ছিল। কাব্যশেষে তিনি স্বয়ং চণ্ডীর মুখে বলিয়েছেন—

কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ॥
কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়॥

চতুর্থত, মুকুন্দরাম বার্ধক্যে কাব্যরচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। দেশত্যাগ করে পুত্র-পরিবার সহ তিনি বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ তখন শিশু। রঘুনাথ জমিদারীলাভের বেশ কিছুকাল পরে কবি কাব্যরচনা করেন। দেশত্যাগের পরে কবির একটি শিশুপুত্রের নাম উল্লেখ আছে। কাব্যরচনাকালে কবি পুত্র-পৌত্রাদির কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত পরিবারজীবনের বহুল অভিজ্ঞতায় (তা প্রবল নয়, বিচিত্র ঘটনাবর্তে ও উদ্দামতায়ও পূর্ণ নয়) মুকুন্দরামের কবিচিত্ত পুষ্ট হয়েছে। সে-জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুর লীলা তিনি অনেকই দেখেছেন, নিজেও ভোগ করেছেন। বয়সোচিত এক ধরনের দূরত্ব পারিপার্শ্বিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট হয়েছে। নিরাসক্তের দৃষ্টি কতকটা আয়ত্ত হয়েছে এই বয়সের গুণে। মানুষের ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তিতাড়না তথা আসক্তির

আলোছায়ায় ভাসমান জীবন এক প্রসন্ন কৌতুকের সৃষ্টি করেছে কবির অধরে।) চিরনবীন এই বালক-পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জীবন থেকে বিদায়ী বৃদ্ধ কবির প্রসন্ন হাস্যের উপহার।

((পঞ্চমত, কিন্তু শুধু বার্ধক্যই এই নিরাসক্ত জীবনবোধের স্রষ্টা নয়। কবির ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রেই জীবনাতীত উর্ধ্বচারী এক কবি-আত্মার স্থিতি। এই কবি-আত্মা জীবনস্রোতে তরঙ্গিত নয়, তার দর্শকমাত্র। এবং স্মিতমুখ দর্শক। ভারতচন্দ্র এক জায়গায় বলেছিলেন,

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী॥
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তা যথার্থ বলে মনে হয় না। এই চিদানন্দের চেতনাযুক্ত চিত্ত সেকালের বাংলা সাহিত্যে যদি কারও থাকে তবে তা মুকুন্দরামের। এই দৃষ্টির বলেই তিনি আপন জীবনের তিক্ততম তীব্রতম অভিজ্ঞতাকেও একান্ত নির্লিপ্ত সুরে উত্তাপহীন কণ্ঠে বিবৃত করেছেন। পিতৃ-পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করলেন, পথিমধ্যে সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠিত হল, দারিদ্র্যের চরমতম স্তরে অপরের কাছ থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা করতে হল, ভাতের জন্য শিশুপুত্র ক্রন্দন করতে লাগল, নিজের ব্যক্তিজীবনের এই ঘটনাকেও কবি নিরাসক্ত দর্শকের মতই বর্ণনা করে গেলেন। আবেগের চড়া সুর কোথাও লাগল না। এ যেন নিজের কারণেই নয়, কবিদৃষ্টির কাছে নিজের জীবনও অপরের জীবনের মতই দূরবর্তী।

(কোনো কোনো বিশিষ্ট সমালোচক মুকুন্দরামের জীবন দুঃখময় বলে মনে করেছেন। দুঃখপূর্ণ জীবন কবিকে দুঃখবাদী করে তুলেছিল। চণ্ডীমঙ্গলে আছে তারই প্রতিফলন। কিন্তু এ মত ঠিক নয়। কারণ,—এক। মুকুন্দরাম জীবনে একটা বড় দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু আজীবন তীব্র

দুঃখ-দারিদ্র্যই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে এমনও নয়। দেশত্যাগের পূর্বে বা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়লাভের পরে আর অস্বাচ্ছল্য কবিকে পীড়িত করেছিল এমন প্রমাণ নেই। দুই। দু-একটি দুঃখের অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা ব্যক্তিগত জীবন দুঃখময় হলেই মানুষ দুঃখবাদী হয় না। মুকুন্দরামের কবিদৃষ্টির কৌতুকবর্ষণে তাঁর গোটা কাব্যই সরস। এবং এই কৌতুকদৃষ্টির উৎসে আছে কবির নিরাসক্ত জীবনবোধ, তাঁর বস্তুতন্ত্রতা।

ষষ্ঠত, মুকুন্দরাম একস্থানে স্পষ্ট করে বলেছেন "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" তিনি কাব্যরচনা করেছেন। বিশেষ করে এ-কথা উল্লেখ করবার তাৎপর্য কি? মুকুন্দরাম নিশ্চয়ই নিজের পাণ্ডিত্য ঘোষণা করবার জন্য এ-কথা বলেন নি। কবির কাব্যদেহ গঠনে সংক্ষিপ্ত পুরাণ কাহিনীর সংযোজন কিছু বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কবি কি এই কথা জানাতেই চেয়েছিলেন? তা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত কারণটি আরও একটু গভীর বলে মনে হয়। কবির জীবনচেতনায় আদর্শবাদ ছিল না, রোমান্টিক সৌন্দর্যাকুতি বা রহস্যজড়িত অস্পষ্টতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক জীবনভাবনার প্রভাব তাঁর মধ্যে এত পরিমাণ ছিল যে মাঝে মাঝে কবির বস্তুবোধেও ফাঁকি জমে যেত। নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত কবিদৃষ্টিও স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলত পুরাণ প্রসঙ্গে। তিনটি ক্ষেত্রে এর প্রমাণ আছে। এক॥ পুরাণকাহিনীর আতিশয্য। দুই॥ চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে (যেমন কালকেতু-ফুল্লরার ন্যায় অনার্য ব্যাধদম্পতীর মুখে) তাদের কথায় পৌরাণিক উদাহরণের প্রাচুর্য। তিন॥ ব্যাধ সমাজের স্বাভাবিক বাস্তব চিত্রের উপরে পুরাণকথিত জীবনবোধের আরোপ। কবির ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রে যে শিল্পীআত্মার প্রতিষ্ঠা তার প্রধান বিচ্যুতি ঘটেছে এই পৌরাণিক ভাবনার অতিরেকে। কবি কি তাঁর চিত্তের সেই দ্বিধা বুঝেছিলেন বলেই অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, অথবা না জেনেই সাধারণভাবেই কথাটি প্রকাশ পেয়েছে?

সপ্তমত, মুকুন্দরাম দেবীর কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেলেন দেশত্যাগ করবার পরে পথের মধ্যে। আর কাব্য লিখলেন বহু দিন পরে। অনেকের মতে

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে। দেবীর প্রত্যাদেশ নেহাৎই মঙ্গলকাব্যের প্রথ রক্ষা এ বুঝতে অসুবিধা হয় না। পথশ্রমে, ক্ষুধায়, ভয়ে ও চিন্তায় কাতর অবস্থায় মুকুন্দরাম দেবীর দেখা পেয়েছেন। এই ভাবনার মধ্যে কবির বস্তুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় আছে। বিকারগ্রস্ত বা ক্লান্ত মনেই বিভ্রম দর্শন সম্ভব। নান ভাবেই কবি প্রথানুগ বর্ণনা করেও ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন এই অলৌকিব ঘটনার সম্ভাব্যতার।

তবে মুকুন্দরামের কাব্য রচনার ক্ষমতা তরুণ বয়সেই প্রকাশ পেয়েছিল কবি বাঁকুড়া রায়কে আপনার কবিত্বশক্তির দ্বারা মুগ্ধ করেছিলেন।

পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি
রাজা দিল দশ আড়া ধান ॥

তাঁর পূর্বপুরুষও কবিত্ব লাভের বাসনায় বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

কয়্যারি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহু কাল ॥

কিন্তু প্রকৃত কাব্য রচনায় নিযুক্ত হতে তাকে অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। রঘুনাথের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া কাব্য নির্মাণ সম্ভব ছিল না। প্রতিভার অধিকারী হয়েও কাব্য রচনার সুযোগের জন্য তাঁকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অন্তরের গভীরে তিনি কি কোনো যন্ত্রণা অনুভব করেন নি? করে থাকলেও তাঁর ঊর্ধ্বগামী আত্মা তাকেও জয় করে নিয়েছে।

পাঁচ ॥ কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য : মুকুন্দরাম-আলাওল-ভারতচন্দ্র ॥

মুকুন্দরামের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝবার জন্য মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান কাব্যের অপর দুই প্রধান লেখক আলাওল এবং ভারতচন্দ্রের চরিত্রপ্রসঙ্গ এসে

পড়বে। সংক্ষেপে তাঁদের জীবনকথা এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে মুকুন্দরামের স্বাতন্ত্র্য নির্ণিত হবে।

আলাওল সপ্তদশ শতকের কবি। তাঁর জীবনকাহিনী ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ।

গৌড়ের জালালপুর ছিল আলাওলদের নিবাস। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা মজলিস কুতুবের অমাত্য। জলপথে যাত্রাকালে হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা পিতাপুত্র আক্রান্ত হলেন। যুদ্ধ করে পিতা বীরের মত শহীদ হলেন। আলাওল কোনক্রমে বেঁচে গেলেন এবং আরাকানে এসে উপস্থিত হলেন। নৃপতি মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ঘোড়সওয়ারের জীবন বরণ করলেন। সঙ্গীত ও নাট্যকলায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল। বাংলা-সংস্কৃত-আরবী-ফারসী ভাষাও ছিল তাঁর আয়ত্ত। সেকালে গুণীর আদর ছিল। সামান্য অশ্বারোহী সৈন্যের তাই রাজসভায় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে বিলম্ব হল না। অশ্ব এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি কাব্য লিখতে আরম্ভ করলেন। মাগনের মৃত্যুর পরেও সুলেমান ও মহমদদের মত রাজামাত্যদের আনুকূল্য তিনি লাভ করেছেন। এই সব আনুকূল্যের ফলে "পদ্মাবতী", "তোহফা", "হপ্ত পয়কর", "সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জমালে"র কতকাংশ রচিত হল। এমন সময়ে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল। সাজাহানের পুত্র সুজা রোসাঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাজার রোষাকর্ষণ করলেন। সম্ভবত দিল্লীর সম্রাটবংশের সুজাকে কেন্দ্র করে রোসাঙ্গ রাজ্যের মুসলমান অমাত্যদের এক অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায়ই সুজা রাজরোষে পড়েন। আলাওল কারারুদ্ধ হলেন। এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছুটা সম্পৃক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। অবশ্য কিছুকাল পরে কবি কারামুক্ত হলেন। কিন্তু রাজকীয় মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা তো গেলই, জীবিকার সংস্থানও রইল না। "সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ।" অর্থাৎ রাজকবি ভিখারি হলেন। অবশেষে ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরল। রোসাঙ্গের কাজীর আনুকূল্যে আবার রাজসভায়

তার প্রবেশ ঘটল, আশ্রয়ও জুটল। "সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জমাল" তিনি শেষ করলেন, "দারা সিকেন্দার নামা" লিখে নৃপতিকে সন্তুষ্ট করলেন।

নাটকীয় উত্থানপতনপূর্ণ ও ঘটনাবহুল আলাওলের এই জীবন-কাহিনী থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে পৌঁছবার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত, জীবনের বহু বিচিত্র এবং উদ্দাম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। হার্মাদ জলদস্যুদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে, রাজবন্দীর দুঃসহ দুর্দশা, অশ্বারোহী সৈনিকের পেশা থেকে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, আলাওল যে রাজসভার কবি ছিলেন এবং যে সব মন্ত্রী সেনাপতির আনুকূল্য লাভ করেছিলেন তারা মুকুন্দরামের পোষ্টার মত গ্রাম্য জমিদার ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্রও একটু বড় ধরনের জমিদারমাত্র ছিলেন, স্বাধীন ও প্রকৃত রাজা নয়। তাঁর রাজসভায় বিলাসকলার অভাব ছিল না, অভাব ছিল প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনবেগের। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বাঙালি কবিরা সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রনীতি থেকে বহু দূরবর্তী ছিলেন। গ্রামকেন্দ্রিক জীবন চর্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থানপতনের তরঙ্গ বড় শ্রুত হত না। বাঙালি কবিদের চিন্তা-চেতনার রাজ্যে তাই রাজনৈতিক জীবন ও মননের প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত ছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরণ নন্দী পরাগল খাঁ এবং ছুটি খাঁয়ের সভায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। সৈনাপত্য-কেন্দ্রীক চিত্তধর্ম এবং প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে উক্ত কবিদের মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বের যুদ্ধ বর্ণনার আধিক্য ঘটেছে। রোসাঙ্গের রাজসভা স্বাধীন নরপতির খাঁটি রাজসভা ছিল। রাজনৈতিক আলোচনা এবং কর্মতৎপরতাই এ-সভায় প্রধান কর্তব্যরূপে অনুশীলিত হয়। আলাওল যে সব কিছু থেকে বিরত হয়ে কাব্য সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন না এমন প্রমাণ মিলছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের গঠনে এর প্রভাব কার্যকর হয়েছে। তৃতীয়ত, আলাওল যাবতীয় ঘটনা-তরঙ্গের নীরব ও নিরাসক্ত দর্শক ছিলেন না। সুফী-সাধক হওয়া সত্ত্বেও এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্তি তাঁর কবি-স্বভাবের অংশ ছিল না। যে-ব্যক্তি হার্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণরক্ষায় সমর্থ হন, ঘোড়সওয়ার

সেনানীর গতি ও শক্তির অধিকারী হিসেবে জীবিকার্জন করেন, অতি সামান্য অবস্থা থেকে উচ্চ রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণে একাধিকবার সার্থকভাবে নিপুণ কৌশল প্রয়োগ করেন এবং সম্ভবত রাজকীয় ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন, তিনি আর যা-ই হোন নিষ্ক্রিয় নন, নিরাসক্তও নন। চতুর্থত, আলাওলের ধমনীতে মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির প্রবাহ, যার পায়ের তলায় "বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন", যার এক হাতে কোরাণ অপর হাতে তরবারী। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় "মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতই স্বমতসর্বস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী। সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার কারণ দেখা যায়, তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম নিপীড়ন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিয়া, আর্মানীয়া জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল।" [সংস্কৃতির রূপান্তর : গোপাল হালদার]। এই গতিবেগ, এই প্রবল বিজীগিষা ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে আলাওলের চিত্তধর্মে অনুপ্রবিষ্ট এবং অভিব্যক্ত।

আলাওলের প্রধান কাব্য "পদ্মাবতী"র বিশিষ্টতা তাঁর ব্যক্তিত্বের পাত্র থেকেই উৎসারিত। মঙ্গলকাব্যের জীবনচিত্রণে যে শিথিল পরিবারমুখিতা, গার্হস্থ্য প্রাত্যহিকের যে নিস্তরঙ্গ পারাবতবৃত্তি, যে কোমল ইন্দ্রিয়ালুতা তা থেকে আলাওল আমাদের যেন অকস্মাৎ "শ্যেনসম ছিন্ন করে" উর্ধ্বে নিয়ে যান,—প্রচণ্ডের মুখোমুখি করে দেন, বিপদের দোলায় সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করেন। যুদ্ধবর্ণনা অবশ্য ধর্মমঙ্গলেও আছে। কিন্তু তার ছন্দে-সুরে সেই উদ্দামতা নেই ; মামুলি ঘটনা ছাপিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার কোনো নবতর সত্যে তার মহিম্ন প্রতিষ্ঠা নেই। আবার মনসামঙ্গলে যে বীর্য-ব্যক্তিত্ব তার সমকক্ষতা অবশ্যই রত্নসেন নৃপতিতে অনুপস্থিত, কিন্তু রত্নসেনের অতি-উল্লসিত বেদুইন-বৃত্তি তাঁর নিজস্ব।

'ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জীবৎকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ সাল। দক্ষিণ রাঢ়ের পেঁড়োয় তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ জমিদার ছিলেন, তাঁদের বংশের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভারতচন্দ্র কিন্তু বাল্যকালে বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করেন। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্শীর কাছে আশ্রয় পান এবং সংস্কৃত ফারসী অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই তিনি কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন এবং আশ্রয়দাতার আদেশে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। অবশেষে কবি গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর পিতার জমিদারী বর্ধমান রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হলে পরিবার বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ভারতচন্দ্র জমিদারী উদ্ধারের জন্য তদ্‌বির-তদারক করতে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে তিনি কারারুদ্ধ হন। কোনোমতে জেল থেকে পালিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে পুরী এসে পৌঁছান এবং মার্‌হাট্টা সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে এসে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন এবং বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবন-দর্শন অভিলাষে পদব্রজে যাত্রা করেন। পথে এক আত্মীয় তাঁকে ধরে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যায়। কবি আবার গৃহী হলেন, দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপার্জনের আশায় তাঁকে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে হল। প্রথমে তিনি ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন; তারপরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে তিনি "অন্নদামঙ্গল" কাব্য লিখলেন।। কিন্তু এই আনুকূল্য সত্ত্বেও তিনি বিশেষ আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। অতি সামান্য মাসোহারায় তাঁকে দিন কাটাতে হত। এবং অন্নদামঙ্গলে উল্লিখিত জনৈক মহাকবির পত্নীর এই উক্তি

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥

... ...

খ'ড়ো-চাল বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥
শাঁখা চুড়ি রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু ॥

সম্ভবত কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। কাব্যরচনার পরে অবশ্য তিনি মূলাজোড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে গৃহনির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। কিন্তু সেখানেও বর্ধমানরাজের কর্মচারীদের (নাগবংশীয়দের) অত্যাচারে প্রতিনিয়ত অতিষ্ঠ হতেন। 'নাগাষ্টক' নামক সংস্কৃত কবিতায় কবি নিজে সে-কথা বলেছেন। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে কবি দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের জীবনের এই তথ্যগুলি তাঁর জীবনের সত্যে নিয়ে পৌঁছে দেবে। প্রথমত, কবির জীবন ঘটনাবহুল। উত্তেজিত ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জীবন চালাতে হয়েছে। নানাভাবে জীবনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কবি খুব প্রীত হন নি বোঝা যায়। কিন্তু বিচিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা তাঁর ছিল। তিনি একান্তভাবে খাঁচার পাখি ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি যে-যুগে জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ভাগ্যে তা চরম বিপর্যয়ের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। চারিদিকের এই ভাঙন ভারতচন্দ্রের জীবনের উপরেও এসে পড়েছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই অরাজকতা ও দারিদ্র্যের অনেকখানি লাঞ্ছনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। জীবনের কোনো পর্যায়ই খুব শান্তির মধ্যে তিনি অতিবাহিত করেন নি। রাজকীয় সহায়তায় তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি। এই বিশ্ববিধানের প্রতি ভারতচন্দ্র তাই বক্রদৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারেন নি। জীবনের কাছ থেকে যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন তাকে নিজের প্রাপ্য বলে ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রসন্ন হাস্যে ভাগ্যের উপহাসকে জয় করতে তিনি পারেন নি। তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তাই বিশ্বকে বিদ্ধ করায় তাঁর প্রচুর উৎসাহ। বিপর্যস্ত জীবনের ছবি আঁকতে ভারতচন্দ্রের কবিচিত্তের অবাধ উল্লাস। দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসে, শিবের বরযাত্রার ভৌতিক সমারোহে, দিল্লীতে ভূতের উপদ্রবে ভারতচন্দ্রের যেন পরম তৃপ্তি। ব্যাধিজীর্ণ এই পৃথিবীর বিপদপাতে তাঁর এক

বিষাক্ত আনন্দ। অথচ এই ব্যাধি তাঁর ব্যক্তিচিত্ত তথা শিল্পী-ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে তিনি যেন হেসে হেসে সমাজভিতে সুড়ঙ্গ কেটেছেন। শুধুমাত্র সমাজভিতেই নয়, মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত প্যাটার্ণটির মধ্যেই তিনি এর প্রতি নিদারুণ বিরূপতা দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের বাচনভঙ্গির ব্যঙ্গাত্মক রূপ এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, চরিত্র গড়তে গিয়ে ক্যারিকেচারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সুযোগ পেলেই সমাজসমালোচনা করেছেন, এমন কি আপন প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিও তাঁর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তৃতীয়ত, ভারতচন্দ্র বহু-শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষার অহঙ্কারও ছিল—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥

কাব্য, ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। অধ্যয়ন-প্রাচুর্য এবং অভিজ্ঞতার বহুলতা তাঁকে জীবনপ্রেমিক না করে নৈরাশ্যবাদী দর্শকে রূপান্তরিত করেছিল। চতুর্থত, ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজসভার কবি। সেই রাজসভার বিলাসী রুচিকে পরিতৃপ্ত করতে হত তাঁকে সরস কবিত্বে—তার রুচি ও রসবোধের অংশীদারও তিনি হয়ে পড়েছিলেন। তাকে আঘাতও করেছেন, উপভোগও করেছেন।

এঁদের তিনজনের জীবন-চেতনাই কত স্বতন্ত্র। এবং এর ভিত্তিতে রয়েছে অনেক পরিমাণ এঁদের জীবন-ঘটনা এবং কতকটা যুগপরিবেশ। ঘটনাবিরল জীবনের সমতাল, পরিবার-জীবনের ছোট হাসি ছোট কথায় লালিত মুকুন্দরামের জীবন, স্মিত কৌতুকে, কচিৎ প্রশান্ত কটাক্ষে পৃথিবীকে ও মানুষকে দেখেছে। গ্রাম্য জমিদারের দ্বারা প্রতিপালিত কবির দৃষ্টিতে নেই ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রতি লোলুপতা অথবা রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের প্রবলতা। জীবনে যে একমাত্র প্রবল ঘটনার অভিজ্ঞতা কবি লাভ করেছিলেন সেখানেও মৌন সহনশীলতায়

ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন এবং রাজকর্মচারীদের অত্যাচারজনিত বেদনাকে তিনি জয় করেছেন। এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের এবং আলাওলের কত গভীর পার্থক্য। ভারতচন্দ্রও বেদনাবিদ্ধ—যুগসঙ্কটে এবং ব্যক্তিগত জীবনঘটনায়,—কিন্তু শাণিত বিদ্রূপদৃষ্টিতে তিনি সদাজাগ্রত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তার ভাষা ও ভাবনাকে শিখরদশনা করে তুলেছে। মুকুন্দরামের রঘুনাথ-সাহচর্যে তার সম্ভাবনা ছিল না। যদিও ফারসী ও সংস্কৃতে তাঁরও ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। রোসাঙ্গের রাজসভা আলাওলকে রাজনৈতিক জীবনতরঙ্গ যতটা আস্বাদ করিয়েছে ভাষাকে প্রসাধিত করবার জন্য ততটা অনুপ্রাণিত করে নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ঘটনাবহুল এবং প্রভূত বিপর্যয়ে ভূকম্পনে সদাচঞ্চল। মুকুন্দরামের মত স্মিতহাস্য দর্শক তিনি নন, প্রসন্নতায় দুঃখ জয়ের সাধনাও তাঁর নয়; আবার ভারতচন্দ্রের মত বক্র ব্যঙ্গদৃষ্টিতে তাকে আহত করার বুদ্ধিজীবী মননশীলতার অধিকারীও তিনি নন। মুহূর্তে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরে পান করার উদ্দাম উল্লাস তিনি অনুভব করেন; সেখানেই তিনি অন্যের থেকে পৃথক।

বিবর্ণ মধ্যযুগেও কিছুটা শক্তিশালী কবিদের জীবন ও ব্যক্তিত্বের সন্ধান করলে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, একেবারে বঞ্চিত হতে হয় না।

এঁদের মধ্যে মুকুন্দরাম সবচেয়ে শান্ত। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও বহুলতার অভাব তাঁর মধ্যে। উত্তেজনায় তিনি চিত্তজয় করেন না, প্রসাধনে নয়নরঞ্জনের দাবি তাঁর নেই। বাইরে থেকে তাঁর আকর্ষণ কম। কিন্তু ভেতর-মহলে তিনি বর্ণহীন নন। তা ছাড়া দ্রুত হৃদয়হরণ করেন না বলেই তিনি স্থায়ী, চোখে চমক লাগে না বলে মনের রাজ্যের সিংহাসন তাঁরই দখলে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক ॥ কাহিনী-নির্বাচন ও শিল্পীমন ॥

মুকুন্দরাম কেন মঙ্গলকাব্য লিখলেন, বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল লিখলেন কেন এই জিজ্ঞাসার মধ্যে তাঁর শিল্পীমনের রহস্যের কিছু পরিচয় আছে। পুরাতন সাহিত্যের পাঠকের কাছে এর উত্তর খুব দূরবর্তী নয়। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা ধর্মঠাকুরের কাহিনী—শুধুমাত্র সাহিত্যধারা হিসেবে এদের প্রতিষ্ঠা নয়, এরা ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মনসার ভক্ত মনসার কাহিনীই লিখবেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যরচনার চেষ্টামাত্র করবেন না, কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক চেতনা নয়, ধর্মসাধনাযুক্ত প্রথানুসরণই তার মজ্জাগত। মুকুন্দরাম কেন লিখলেন তার কারণ কবির ধর্মবিশ্বাসে, সাহিত্যিক বিচার-বোধে নয়। কিন্তু মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গল-দেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্তন একটা সাহিত্যধারায় মাত্র পর্যবসিত হয়েছিল। চৈতন্য-প্রভাবে চণ্ডী-মনসার ক্ষমতায় বিশ্বাস তখন ক্ষয়িত। অন্তত এই অনার্য কুলসম্ভূত দেবদেবীর উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি পাবার যে প্রাথমিক উৎসাহে বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবের মঙ্গলকাব্য লিখিত তা আজ আরও সুদূর স্মৃতিতে স্তিমিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেও এ সত্য প্রমাণিত। মুকুন্দরাম কাব্যশেষে স্বয়ং চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়েছেন। 'কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ'। অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল লিখতে কবিকে কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সীমাভুক্ত হতে হয় নি। চৈতন্যোত্তর পর্বে মঙ্গলকাব্য একটা সাহিত্যিক 'প্যাটার্ণ' বা কাব্যাকৃতিতে পরিণত হয়েছিল। কাজেই মুকুন্দরামের মত বড় কবি কেন এ জাতীয় একটি কাব্যাদর্শের অনুসরণ করলেন এ প্রশ্ন তোলা খুবই সঙ্গত। কারণ কবির এই নির্বাচনের মধ্যে তাঁর শিল্পীমন অনেকখানি ধরা পড়বার কথা।

মুকুন্দরামের বৈষ্ণবপ্রীতি নানাভাবে তাঁর কাব্যমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এ-কথা মনে করা যেতে পারে বৈষ্ণবপদসাহিত্যের অন্যতম রচয়িতারূপে

তিনি একজন মহাজন পদকর্তা হয়ে উঠলেন না কেন? এর উত্তর তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপের মধ্যেই রয়েছে। বস্তুভারহীন, তথ্যোত্তীর্ণ অনুভূতি-প্রাধান্য বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। হৃদয়ের গভীর রহস্যলোকে, আশা-নিরাশা, সংশয়-সন্দেহ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এক কুহেলি আচ্ছন্ন মনোরাজ্যেই বৈষ্ণবপদের নিত্য প্রবেশ। মুকুন্দরামের কবিদৃষ্টি রহস্যলোকভেদে নিরুৎসাহ এবং সম্ভবত অসমর্থও, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম ঊর্মিমুখরতা তাঁর বোধকে স্পর্শ করে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণযোগ্য। "মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয় ভাববিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না।" [ক. বি. প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'র ভূমিকা]

বোধ হয় এই একই কারণে মনসামঙ্গল কাব্যধারাও তাঁর কবিচিত্তের আশ্রয় হয়ে ওঠে নি। মনসামঙ্গলের কাব্যকল্পনায় এমন একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আছে, সর্বত্যাগী কিন্তু জীবনরসপুষ্ট এমন এক সংগ্রামী চরিত্রের কল্পনা আছে যা প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা হয়ে ধরা দেবার নয়। বিশেষ ক'রে বেহুলা-চরিত্রের মধ্যে মৃত্যুস্রোতে ভাসমান জীবনকে দুহাতে আঁকড়ে ধরবার যে রোমান্টিক কামনা ব্যঞ্জিত হয়েছে মুকুন্দরামের প্রতিভার স্বরূপেই তার থেকে পার্থক্য।

কবির ধনপতি-আখ্যানে খুল্লনা-ধনপতির পূর্বরাগ-বিবাহ-বিরহ ও পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে একটি অস্পষ্ট প্রেম-কথা রচনার আভাস মিলছে। ধনপতির পারাবত-ক্রীড়ার কথা দ্বিজ মাধবেও আছে। কিন্তু মুকুন্দরামে ধনপতির কপোত লক্ষপতির গৃহচূড়ে উড়ে বসে নি, খুল্লনার অঞ্চল আশ্রয় করেছে। ধনপতির কথায় যে দ্ব্যর্থকতা আছে—

কে তুমি পায়রা লয়ে যাওহে সুন্দরী।
পারাবত লয়ে মোর প্রাণ কর চুরি॥

তাতে বক্তার প্রণয় নিবেদনের সুর বেজেছে। বিশেষ করে খুল্লনার পরিহাস-রসিকতায় পূর্বরাগ-সঞ্চারের ইঙ্গিত প্রায় স্পষ্ট। সে বলেছে—

প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন॥
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিথ্যা কার্যে কর সাধু কপট চাতুরী॥
তুমি ত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা॥

এবং সুচতুর ধনপতির কাছে খুল্লনার মনোভাব অজ্ঞাত রইল না, "পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্যগতি।" একদিকে পূর্বরাগের এই সুর, অন্যদিকে কিছু বিস্তারিত (কাহিনীকাব্যের নিজস্ব আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিতে) বিরহ-ক্রন্দন বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 'বসন্ত আগমনে খুল্লনার খেদ', 'শারী-শুক-প্রতি খুল্লনা', 'তরুলতার প্রতি খুল্লনা', 'কোকিলের প্রতি খুল্লনা', 'খুল্লনার বিরহ-বেদনা' প্রভৃতি অংশে প্রকৃতির পরিবেশে বিরহিনী নারীর বেদনাধারা অনেকখানি উৎসারিত। একটি প্রেমকাহিনীর পূর্ণরূপ গড়ে উঠবার উপকরণ ধনপতি-কাহিনীর প্রথমাংশে ছিল, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয়, বিশেষ করে মুকুন্দরামের শিল্পীপ্রবণতায় সেরূপ সিদ্ধি সম্ভব ছিল না।

রোমান্টিক প্রণয়-চেতনার আকস্মিক মুক্ত দীপ্তিতে নয়, নিত্যপ্রবহমান পরিবার-ধর্মের কথায়ই মুকুন্দরামের পারদর্শিতা। এই পরিবার-ধর্ম থেকে কাহিনী যেখানেই উঁচু সুরে মনোবীণাকে বেঁধে দিতে চেয়েছে তার সেখানেই ছিঁড়ে গেছে। প্রেম-কথা চিত্রণে অগ্রসর হয়েও তিনি দ্বিধামুক্ত নন। মুক্ত-প্রেমের লীলা-বিলাস-বিচিত্রতা ও বর্ণাঢ্যতা অপেক্ষা দাম্পত্য প্রণয়ের প্রাত্যহিক স্তিমিত-আবেগের বর্ণনায় কবির আগ্রহ অনেক বেশী। যুদ্ধের প্রসঙ্গ কাহিনীর অনুরোধে একাধিকবার এসেছে। কিন্তু সহজেই অনুভব করা যায় কবির মন সেখানে জাগে নি। সে-বর্ণনা মামুলি এবং একঘেয়ে। কিছু বীররস এবং

ডাকিনী-যোগিনী সহযোগে কিছু বীভৎস রসসৃষ্টির চেষ্টাও আছে। বাংলা রামায়ণ-মহাভারত যুদ্ধবর্ণনায় অনেকটা সহজ সাফল্য লাভ করেছিল ; কোনো কোনো ধর্মমঙ্গলের সীমিত সার্থকতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে মুকুন্দরাম ন্যূনতম কৃতিত্বের দাবিও করতে পারেন না। যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে কবি নিজের ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। শ্রীমন্তকে রক্ষা করবার জন্য সিংহল-রাজসৈন্যের সঙ্গে ভূতপ্রেত ডাকিনীযোগিনী পরিবৃত চণ্ডীর সংঘর্ষের একটি হুবহু সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মিলবে উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর বিরুদ্ধে চণ্ডীর অভিযানে। এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধের শেষে মৃত সেনাদির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ফলে যুদ্ধে যুদ্ধত্ব কিছুই থাকে নি, গতানুগতিক দেবীভক্তির সুরই উদ্গীত হয়েছে।

মুকুন্দরাম কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর পৌরাণিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তাঁর কাব্যদেহের একটি প্রধান লক্ষণ বলে পুরাণ কাহিনীর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু কবির হাতে এই কাহিনীগুলি কোনো বিশিষ্ট রসসৌন্দর্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয় নি। পুরাণ-ঘটনার সমুচ্চ এবং বর্ণাঢ্য চিত্র মুকুন্দরামের ভাষায় বিদ্ধ হবার নয়। জীবনঘটনার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে কৌতুকহাস্যের অকস্মাৎ বিচ্ছুরণে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের গভীরে নূতন আলোকপাতে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব। পৌরাণিক ঘটনার রাজ্যে কর্মযজ্ঞের যে ঘনঘটা, জীবনের যে মহাসঙ্গীত ধ্বনিত তার প্রবল, গম্ভীর ও সমুন্নত সুরলহরী কবির আয়ত্তে ছিল না।

তিনি পরিবারতন্ত্রের কবি। বাঙালীর গৃহজীবনের শ্লথগতি স্তিমিত ঘটনার চিত্রাঙ্কনেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। কাহিনীর নানা শাখায়িত বিস্তার, পল্লবিত অলঙ্করণ এবং প্রথাবদ্ধতার মধ্য থেকে কবির সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কবির বাস্তবদৃষ্টি আপন অভিজ্ঞতার জগৎ বাঙালি পরিবার-জীবনকেই বেছে নিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীধারায় অন্য ধরনের দুর্বলতা থাকলেও মুকুন্দরামের ব্যক্তি-প্রবণতাকে যথোচিত সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁর

কবিদৃষ্টি এবং সৃষ্টিক্ষমতাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই তাঁর আপন রচনাশক্তির সর্বাধিক সাফল্যের সম্ভাবনা। মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলে পরিবার-জীবনের কথা আছে, কিন্তু কাহিনীর প্রধানতম আকর্ষণ একটা আদর্শবাদের দিকে ; অথবা বহু বিস্তৃত এবং বিচিত্র যুদ্ধ-ঘটনার বর্ণনায়। অবশ্য মঙ্গলকাব্যমাত্রেই সমাজ ও পরিবার-জীবনের যে ছবি প্রাপ্তব্য তা থেকে মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা বঞ্চিত নয়। বিবিধ পূজার্চনা, মেয়েলী অনুষ্ঠান, বিবাহ, সাধ এবং নবজাতক শিশুকে কেন্দ্র করে নানাবিধ স্ত্রীআচারের বর্ণনা সর্বত্রই আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য এই প্যাটার্ণ-নিরপেক্ষভাবেই পারিবারিক জীবনলীলার উপভোগ্য কাহিনী হিসেবে গ্রাহ্য।

মুকুন্দরামের কৃতিত্ব পারিবারিক জীবনের নিস্তরঙ্গ সামান্যতম আয়োজনকে রসাবেদনে অসামান্য করে তোলার মধ্যে। বাচনভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং কাহিনীকথনের ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক ও কটাক্ষের আলিম্পনায় তিনি পুরাতন বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। সর্বোপরি ক্ষুদ্র টাইপ-চরিত্র সৃষ্টিতে নৈপুণ্য এবং ক্বচিৎ গভীরতা প্রদর্শনে কবিপ্রাণের নিশ্চিত উদ্বোধন লক্ষ্য করা যায়।

দুই ॥ বাস্তবতা : কবির বিশিষ্টতা ॥

মুকুন্দরাম রোমান্টিক ছিলেন না, আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। বিষয়নির্বাচনে তাঁর শিল্পীসত্তার এই বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে। এমন কাহিনী কবি বেছে নিয়েছেন যেখানে কল্পনাতিরেক, ব্যঞ্জনাপ্রাধান্য, সূক্ষ্ম চিত্তবিস্ফার এবং রহস্যমণ্ডিত অস্পষ্টতা নেই, আবার আদর্শবাদের উচ্চকণ্ঠও সেখানে ধ্বনিত নয়। মুকুন্দরামে ক্বচিৎ গীতিপ্রবণতা আছে, কিন্তু আখ্যানকাব্যের কাঠামোকে তা লঙ্ঘন করতে চায় নি ; কোথাও এর বস্তুধর্মে বাধার সৃষ্টি করে নি।

বাংলাদেশের পুরাতন কাব্যধারায় বৈষ্ণব কবিতাকে বলা চলে রোমান্টিক

সুরের রচনা, মঙ্গলকাব্যকে চিহ্নিত করা উচিত বাস্তবতাধর্মী সাহিত্য হিসেবে। সব বৈষ্ণব কবি সমান রোমান্টিক নন। চণ্ডীদাসের সমুচ্চ রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও রূপরচনার তুলনায় বিদ্যাপতির তীক্ষ্ণ বস্তুবোধ এবং তির্যক ভাবনা অনেকখানি বাস্তবধর্মী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও সব ধারায় বাস্তবতার অবকাশ সমান নয়। মনসামঙ্গলের কাহিনীকল্পনায় এবং চাঁদ সদাগর ও বেহুলাচরিত্রে রোমান্টিক ভাবনার কিছুটা স্থান আছে। অবশ্য সব মঙ্গলকাব্যেই মধ্যযুগের বাঙালির জীবনের বাস্তব ছবিই প্রধান হয়েছে। বাঙালির সমাজ এবং পরিবার-জীবন; জাতকর্ম থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবখণ্ডের কথা অবশ্যই থাকবে, অলৌকিক ঘটনার ভূমিকাও হবে বেশ সুবিস্তৃত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যকথিত দেবতারাও বাস্তব পৃথিবীরই মানুষ—একান্ত সাধারণ, রক্ত-মাংসের, বেদনা-আনন্দের, দুর্বল আবেগাতিরেকের মানুষ, কোনো অতিমানুষী শক্তির অধিকারীও তারা নয়। অলৌকিক ঘটনার সমারোহও একটা সাধারণ প্রথানুগত্য অথবা দৈবীভক্তির পথ ধরে এসেছে। তাদের মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য দেহাংশ বলে গণ্য করতে হবে, কিন্তু কাব্যগুলির প্রাণধর্ম পর্যন্ত এরা পৌঁছায় নি। মঙ্গলকাব্যগুলির উৎসে যে মানব-ভাবনা সক্রিয় তা বস্তুধর্মী, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানুষের বাস্তব কামনাবাসনা তুচ্ছ নয় মঙ্গলকবির ভাবনায়। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই, পুত্রকলত্র পরিজন নিয়ে আনন্দঘেরা সংসার চাই, রোগ শোক দুঃখদারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই। 'ইহলোকে সুখভোগ' এবং অন্তে যে স্বর্গ চাই তাও পার্থিব জীবনেরই একটা বর্ণাঢ্য রূপ মাত্র। মঙ্গলকাব্যের সব কটি কাহিনীই পার্থিব দুঃখমোচনের কথায় মুখর। পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রণয় আকুতিতে মাটির কামনা বাজে নি, পার্থিব ভোগ ও সাংসারিক প্রীতি নয়, প্রেমের সুগভীর বেদনায় মুক্তির গানই সেখানে বেজেছে।

মঙ্গলকাব্যের এই সাধারণ বস্তুধর্মের মধ্যেও আবার মুকুন্দরাম বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী। তাঁর এই বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানযোগ্য

প্রথমত, মুকুন্দরাম অভিজ্ঞতার কবি। তাঁর বাস্তবচেতনার ভিত্তিতেও অভিজ্ঞতাই প্রথম কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপদান বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষে হয়তো সুবিধাজনক। যে-সব ঘটনা এবং যে-জাতীয় মানুষের সংস্পর্শে তিনি প্রত্যক্ষত এসেছেন তাদের কথা বলায় কল্পনার ঋণ স্বীকার করতে হয় না। সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট থাকে।* কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে পদার্পণে তাঁর বাধা কোথায়? শিল্প প্রকৃতির আরসি নয়। এ কথা বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষেও প্রযোজ্য। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যের অভিজ্ঞতাকে মেলাতে হয়। তারই নাম জ্ঞান। বাস্তববাদী শিল্পী যদি আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সর্বস্ব বলে মনে করেন তার বাইরেই যদি তাঁর পদস্খলন ঘটে তবে তাঁর সৃষ্টির গৌরবও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে

তাছাড়া শিল্পীচিত্তে বস্তুকে ছাপিয়ে কল্পনার লীলা যখন প্রধান হয়ে ওঠে তাকে রোমান্টিকতা বলতেই হবে। কিন্তু বস্তুর প্রাধান্য মেনে নিয়ে কল্পনা যখন তাকে সম্পূর্ণ করে তোলে, তার অভাব মেটায় অথবা কল্পনা যখন বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছাড়িয়ে যায় না তখনও কি শিল্পীচেতনাকে রোমান্টিক বলতে হবে? শিল্পে কল্পনা থাকবেই। আসল সমস্যা তার প্রাধান্য নিয়ে, তার ভঙ্গি ও স্বরূপ নিয়ে। শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী শিল্পীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমায় বদ্ধ নন, বহুর অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানসাধনায় তাঁরা যেমন আত্মস্থ করেন তেমনি কল্পনার সহায়তায় বস্তুবিশ্বের ব্যাপক ও গভীর সত্যকে আয়ত্ত করবেন। কিন্তু তাঁদের কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতায় কল্পনার পথ ধরেও বস্তুসত্যে গিয়েই তাঁরা পৌঁছবেন। তাঁদের সে রচনা বস্তুরূপে সত্য হবে, আত্মভাবনার আরোপে কবিচেতনার বাহনমাত্র হবে না। এ জাতীয় কামনাকে যদি বাস্তববাদী কল্পনা বলি তাহলে রোমান্টিক কল্পনা থেকে এদের পার্থক্য সূচিত হবে। প্রথম শ্রেণীর

*"Realism in literature is an attitude which purports to depict life and to reproduce nature, in all its aspects, as faithfully as possible."
[Encyclopædia of Literature, Vol. I]

কল্পনায় বস্তুসত্যই লক্ষ্য, কল্পনা উপলক্ষ মাত্র। অপর ক্ষেত্রে কল্পনাই হল লক্ষ্য। কল্পনা মাত্রে পক্ষীজাতীয়। কিন্তু বাস্তববাদী কল্পনা সেই ধরনের পাখি যাদের ডানায় আকাশের সুদূরকে স্পর্শ করবার জোর নেই, কামনাও। সে উড়ে উড়ে মাটির পৃথিবীর বন্ধন কাটাতে পারে না, চায়ও না। রোমান্টিক কল্পনার পাখির ডানায় নীল আকাশের স্বপ্ন

মুকুন্দরামে বাস্তববাদী কল্পনারও অভাব। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কবি। কবি অবশ্য শিক্ষিত লোক ছিলেন। 'বিচারিয়া অনেক পুরাণ' তিনি কাব্য লিখেছিলেন—এ তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। কিন্তু পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে কবিচিত্তের সংসক্তি ঘটে নি।

মুকুন্দরাম কল্পনায় দীন। যে যুদ্ধ তিনি দেখেন নি তার বাস্তব রূপাঙ্কনে ব্যর্থ হয়েছেন। যে বণিকবৃত্তি তাঁর তথা সমগ্র বাংলাদেশের ষোড়শ শতকীয় অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্তু তার বিবরণ হয়ে উঠেছে হাস্যকর। ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতাই শুধু হাস্যকর নয়, তাদের চরিত্র বা আচরণের কোথাও বণিকসুলভ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় নি। বণিকপ্রবর ধনপতি পায়রা নিয়ে অলস ক্রীড়ায় রত; রাজার সখের পাখির জন্য সোনার খাঁচা তৈরী করতে গৌড়দেশে গমনই তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সীমা; স্মরণাতীত কালে তাঁদের পরিবার বিদেশে বাণিজ্যে গিয়েছে; বাণিজ্যতরীগুলি জলের নীচে ডোবানো রয়েছে বহুকাল ধরে; পথের পরিচয় তার জানা নেই, এমন কি নৌকার মাঝিকেও অনভিজ্ঞতার জন্য তাকে ভৎর্সনা করতে হয়েছে;—কড়ির ঝাঁক্ যখন এসে নৌকা আটকে ধরল

সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মনে কর পুটিমৎস্য খাই॥
কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাষা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥

নেহাৎই গল্পের অনুরোধে এরা বণিকরূপে পরিচিত হয়েছে, বণিকের কাজ

করেছে; কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ লাগে নি। বরং বণিকদের গ্রাম্য-প্রধানদের মত কুৎসা-কলহ বা অলস ধনী ধনপতির কামদুর্বল সংসারধর্ম জীবন্ত, সরস এবং উপভোগ্য। কারণ এরা কবির অভিজ্ঞতার সীমার বাহিরে নয়। ব্যাধজীবনের সঙ্গে সাধারণ পরিচিতি কবির ছিল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে (যা কবির অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল না অন্ত্যজ ব্যাধশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে) যেখানেই তিনি সামান্য কল্পনারও আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানেই সাহিত্যিক সাফল্য স্খলিত হয়েছে, রচনায় আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে "বাস্তব ঘটনাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিসাধনার আদর্শে পরিমার্জিত করিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতুর বিবাহ-ব্যাপারে বরের পিতা সোজাসুজি কন্যার পিতার নিকট গিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধসুলভ সরলতার সহিত পণ নির্ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দরামে কিন্তু এই সমস্ত দরদস্তুর ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, উচ্চবর্ণের রীতিনীতি তিনি নির্বিচারে নীচবর্ণে আরোপ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্যপশু-শিকারে নিযুক্ত ব্যাধের যেরূপভাবে ঘটিয়া থাকে—সিংহের আক্রমণে; অবশ্য নিদয়া উচ্চবর্ণসুলভ হিন্দু-আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া সহমরণে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট মুকুন্দরাম কিন্তু এরূপ প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কাব্যের আভিজাত্য বজায় রাখিতে ধর্মকেতু-নিদয়াকে বৃদ্ধবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধ পরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, শাসনের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।" কিন্তু কেন? এর একটি কারণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ; কিন্তু অপর একটি কারণ ব্যাধসমাজের খুঁটিনাটি রীতিনীতি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতার অভাব।

ব্যাধের শিকার সম্বন্ধেও কবির স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। কালকেতুর

শিকার ব্যাপারটি তাই বাস্তব বর্ণনা না হয়ে তার শক্তির অতিশয়তাপ্রযুক্ত অসম্ভব কথায় পরিণত হয়েছে। শিকার প্রসঙ্গের বেশির ভাগই পশুদের মধ্যে মানবভাব আরোপ করায় স্বতন্ত্র রসের আকর হয়ে উঠেছে। কবি আপনার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এভাবে পূরণ করতে চেয়েছেন। কল্পনার দ্বারা আপন অভিজ্ঞতার বাহিরের সম্ভাব্য সত্যকে বিদ্ধ করতে পারেন নি। কালকেতু রাজা হল। ব্যাধের রাজা হওয়া শুধুমাত্র মুকুন্দরামের কেন সকলেরই অভিজ্ঞতার বাহিরে। কবি সদ্য রাজ্যপ্রাপ্ত ব্যাধের রাজকার্যের মধ্যে বড় প্রবেশ করতে চান নি। রাজা কালকেতু মুকুন্দরামের রচনায় কোনো স্পষ্ট মূর্তি ধরে নি। মুকুন্দরাম যে কয়জন রাজার কথা বলেছেন আচার-আচরণে আরড়ার রঘুনাথ জমিদারের চেয়ে তারা উচ্চ স্তরের ব্যক্তি নন। কবি আপনার পরিচিত জমিদারী কর্মতৎপরতার বাহিরে পা বাড়াতে চান নি।

বারবার তাঁর কাব্যে কবির জীবনের সব চেয়ে উত্তেজিত ঘটনার প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের স্থানে কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কখনো ব্যক্তিগত অত্যাচার দেখা দিয়েছে এই মাত্র।

চরিত্র চিত্রণে কবি একান্ত পরিচিত সামাজিক টাইপকেই আশ্রয় করেছেন, তাতেই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ; কোনো অসাধারণ, অভিনব উপকরণের সন্ধান করেন নি। জীবনঘটনায়ও সর্ব পরিচিত পরিবারজীবনের চিত্রাঙ্কনেই তিনি অসামান্য রসনিবেদন করেছেন।

মুকুন্দরামের বাস্তবতা অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কল্পনায় দীন। এই অভিজ্ঞতা আবার স্তিমিতগতি, ঘটনাবিরল, সামান্যতা সর্বস্ব। কবির দৃষ্টিতে গভীরতা ছিল। পর্যবেক্ষণের সেই শক্তি, এবং যে-কোনো পরিস্থিতির মধ্য থেকে স্নিগ্ধ কৌতুক নিষ্কাশনের ক্ষমতা তাঁকে অনন্য সাফল্য দিয়েছে। কবির রচনায় তাই নিত্যকার পরিচিত মানুষ ও সংসারও কিঞ্চিৎ নূতন এবং অনেকখানি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত মুকুন্দরামের অভিজ্ঞতা প্রধানত পরিবারজীবনের নানা ঘটনায়

সীমাবদ্ধ। এই পরিবারজীবন চিত্রণেই কবির সাফল্য। বাঙালি পরিবারে ঘটনার বাহুল্য থাকে না। ভাবাবেগের উত্তেজনা অথবা সুতীব্র দূরাকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র দুঃসাহসিক কর্মাভিযান কিংবা বর্ণাঢ্য পটভূমির সন্ধান সেখানে মিলবে না। কবি ঐ জাতীয় রসের রসিক নন, আমরা আগেই দেখেছি। কোনো কোনো বাস্তববাদী শিল্পী হয় তো জীবনের এইরূপ সব উঁচু সুরের চর্চায়ই মুক্তি পান। বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (অবশ্য তাঁর সাম্প্রতিক রচনাবলীতে আদর্শবাদের সুর বেশ তীব্র হয়ে উঠছে) কাহার বাউরিদের জীবনের প্রগলভ প্রবৃত্তিতাড়না 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা সাপুড়েদের উন্মাদনাপূর্ণ জীবন-রোমাঞ্চ 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' অথবা কবিওয়ালার জীবনের বর্ণবহুল অভিজ্ঞতার রূপাঙ্কনেই উদ্‌বুদ্ধচিত্ত। মুকুন্দরাম জীবনের এই রূপ পরিহারের পক্ষপাতী। বিপরীত প্রান্তে তাঁর বাস্তববাদী মনের স্থিতি। দীনবন্ধুর মত বাস্তববাদী নাট্যকার নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক জীবনের ছবি আঁকায় তেমন আগ্রহী নন ; পারিবারিক পরিবেশে সাধারণ নরনারীর চরিত্র প্রাণবন্ত করে তোলার চেয়ে বক্র, বিকৃত এবং দুর্ধর্ষ মানুষের দিকেই তাঁর আকর্ষণ বেশি। মুকুন্দরামের বাস্তবতা মূলত পরিবারজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকের চিত্রাঙ্কনেই উদ্‌বুদ্ধ। এই জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যদৃষ্ট পাত্রপাত্রীই তাঁর শিল্পীমনের মানুষ।

চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি অংশ। দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, পার্বতী উমার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। উমা-মহেশ্বরের বিবাহকাহিনী কালিদাসের মত মহাকবিও উপকরণ হিসেবে অবলম্বন করেছেন। ঐ একই উপকরণ নিয়ে মুকুন্দরাম কিন্তু বাঙালি-পরিবারের একটি খণ্ডচিত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাম্পত্য-জীবন, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত মেয়ের লাঞ্ছনা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতির একটি রসোজ্জ্বল ছবি পৌরাণিক পটভূমির মধ্যে কবির মৌলিক প্রবণতার পরিচয় বহন করছে দারিদ্র্যই এখানে প্রধান সমস্যা। ধনপতির কাহিনীতে দুই সতীনের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে একটা গোটা পরিবারের দুই পুরুষের ইতিহাস ধরা পড়েছে। ধনপতি

ধনাঢ্য ব্যক্তি, তার সমস্যা তাই স্বতন্ত্র। এই দুইটি কাহিনী যুক্তভাবে ধরলে উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর পরিবার-জীবনের পূর্ণ ছবিই শুধু প্রকাশ পাচ্ছে না, সমকালীন পরিবার-সমস্যার কেন্দ্রটিও যেন স্পর্শ করা যাচ্ছে।

চণ্ডীমঙ্গলের অপর কাহিনীটি অন্ত্যজ ব্যাধসমাজের। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বর্বর জীবন-উল্লাসের প্রতি কবির কোনো বিশেষ আকর্ষণ যে ছিল না তা আগে নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কবি নিজের ইচ্ছানুসারে এই কাহিনী নির্বাচন করেন নি। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যানুমোদিত কাহিনীতে আখেটিক বৃত্তান্তটি অপরিহার্য। মুকুন্দরাম প্রসন্নচিত্তেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। অন্ত্যজ-সমাজের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ব্যাধেদের পরিবার-জীবনের স্বাতন্ত্র্য কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি অবশ্য কখনো ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ব্যাধজীবনের উপরে আরোপ করে ফেলেছেন আবার কখনো আজগুবি কল্পনাকে (কালকেতু শক্তির আতিশয্যে যে ভাবে পশুহনন করছে তা সম্ভবের সীমা ছাড়িয়েছে, আর পশুপক্ষীদের উপরে মানবাচরণের আরোপ তো নিশ্চিতই আজগুবির পর্যায়ভুক্ত) প্রশ্রয় দিয়েছেন। কবির অনভিজ্ঞতাই এর জন্য যে অনেকখানি দায়ী আগে তা বলেছি। অন্ত্যজ এই সব শ্রেণীর সঙ্গে যে-পরিচয় কবির ছিল তা কিছুটা বাইরের হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই ব্যাধজীবনের চিত্রাঙ্কনে কোনো আভ্যন্তরীণ ছবি কিংবা কেন্দ্রীয় সমস্যার সন্ধান মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি যুগপৎ Realist এবং satirist। তার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই নয় যে রিয়ালিস্ট মাত্রই স্যাটায়ারিস্ট। বাস্তববাদী শিল্পী গহন গভীর জীবনবোধের অধিকারী হতে পারেন। এইরূপ অনেক সাহিত্যিকই মহৎ পদবাচ্য হয়েছেন। কোনো কোনো বাস্তববাদী অবশ্য জীবনের অরঞ্জিত পূর্ণচিত্রের দ্রষ্টা বলেই তার দুর্বলতা সম্পর্কে মোহমুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ ক্ষরিত হয়। মুকুন্দরামকে স্যাটায়ারিস্ট বলা চলে না।

জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিরূপতা না থাকলে বিদ্রূপরস প্রকাশ পায় না। মুকুন্দরামের চোখে বক্রতা নেই, সমাজসংস্কারের বাসনা নেই, দুঃখের অভিজ্ঞতাও জীবনকে বিবর্ণ ও অর্থহীন করে দেয় নি। মুকুন্দরামের হাস্য প্রসন্ন এবং স্মিত। প্রগল্‌ভ ভাঁড়ামিতে তাঁর উৎসাহ নেই। মুকুন্দরামের হাস্যস্থল দৈহিক প্রক্রিয়া নয় বলেই বুদ্ধির উত্তাপ এর মধ্যে লক্ষণীয়, তবে বুদ্ধির অসিক্রীড়ায় কবির বড় আসক্তি নেই।

মুকুন্দরাম জীবনকে সমগ্রত দেখতে চেয়েছেন। জীবনস্রোতে আবেগে উল্লাসে ভাসমান তিনি নন। জীবনলীলায় তরঙ্গিত না হয়ে তার এক প্রান্তে দর্শকের ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন। সম্ভবত বার্ধক্য কবিকে এই দৃষ্টির অধিকারী হতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য কবির ব্যক্তিচিত্তের নিরাসক্ত জীবনবোধই এর মুখ্য নিয়ন্ত্রা। বাস্তবতার সঙ্গে এই নিরাসক্তির (detachment) সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।* তাঁর কৌতুকের ভিত্তিতে এই আসক্তিহীনতা সক্রিয়। অবশ্য মুকুন্দরামে এই মনোভাব সন্ন্যাসীসুলভ জীবনবিবিক্ত নয়। মুকুন্দরাম জীবনকে ভালোবেসেও আবেগে ও ভোগে তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যান নি যাতে জীবনরস আস্বাদের থেকে বঞ্চিত হতে হয়। মুকুন্দরাম ভোগী নয়, রসিক। ভোগী যে সে জীবনে নিমজ্জিত; রসিক জীবন থেকে ততটুকু দূরের যতটুকুতে বিষয় ও বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। এই দূরত্ব ছাড়া আস্বাদ সম্ভব নয়। মুকুন্দরামের কৌতুকের উৎস এই নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বে। জীবনের এই স্মিতমুখ দর্শক হাস্যের আলো বিকীর্ণ করে প্রাত্যহিকের তুচ্ছতাকে উজ্জ্বল করেছেন, নির্জীব ঘটনা-বিবরণকে সরস করে তুলেছেন, গতি দিয়েছেন।

মুকুন্দরামকে একসময়ে দুঃখবাদী বলে চিহ্নিত করা হত। তিনি সুখের কথায় বড় নয়, দুঃখের কথায়ই তাঁর সৃষ্টিকৃতিত্ব এমন মত প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরামের কাহিনীতে দুঃখের কথা আছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগে

*"Realism...reflects detachment"...[Encyclopaedia of Literature Vol.1.]

শিবের শোকবিহ্বলতার ক্ষণস্থায়ী উল্লেখের পরেই যজ্ঞধ্বংসের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ বীভৎস কিঞ্চিৎ সরস বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। কবি এখানে পুরাণানুগ, শুধুমাত্র সরস মন্তব্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি কটাক্ষে

ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
পৈতা দেখাইয়া কান্দে ॥

তাঁর মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

শিবগৌরীর দাম্পত্যজীবনের প্রসঙ্গে কবি তাদের দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বারবার বলেছেন। কিন্তু দারিদ্র্যজনিত দুঃখের কথা কোথাও বড় হয়ে ওঠে নি। কবি এই দারিদ্র্যের বাস্তবতা অস্বীকার করেন নি, একে মায়া বলে উড়িয়ে দেন নি, কিন্তু এই দুঃখের বর্ণনায় পাঠকচিত্তে করুণরস উদ্রেক করার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। কবি শিবের দারিদ্র্যের পটভূমিতে তার ভোজন-রসিকতা, স্বামী-স্ত্রীর কলহ প্রভৃতি প্রসঙ্গের সরস বর্ণনা দিয়ে পাঠককে দুঃখ ভুলিয়েছেন।

কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবনে অর্থাভাব ছিল, সম্ভবত অন্নকষ্টও কখনো দেখা দিত। কিন্তু কালকেতুর ভোজনের বহুলতা, শিকার পদ্ধতি থেকে সব আচার-আচরণের মধ্যেই এমন একটা অভব্য অসঙ্গতি, সরলতা ও বর্বরতার এমন এক ধরনের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় যার কৌতুককরতা অবশ্য উপভোগ্য। ফুল্লরার বারমাস্যায় নীরস দুঃখবর্ণনায় যে বেদনারস কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নি এ-সত্য দৃষ্টি এড়াবার নয়*। আসলে সপত্নীভীতির আশঙ্কা এই দুঃখ বর্ণনার অতিশয়োক্তিকেও একটি সরস স্বাদুতা দিয়েছে।

চরিত্রচিত্রণেও মুকুন্দরাম কৌতুকরসকে একটি সাধারণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বলা উচিত ব্যক্তিগত কিংবা টাইপগত স্বাতন্ত্র্য থাকা

*রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যে অস্পষ্টতা" নামক প্রবন্ধে বারমাস্যার দুটি চরণ "দুঃখ কর অবধান…………আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান" উদ্ধার করে বলেছিলেন যে এর মধ্যে আমানি অনেকখানি আছে, দুঃখ কিছুই নেই।

সত্ত্বেও কবির কৌতুকদৃষ্টিপাতে প্রায় সব কটি উল্লেখ্য পাত্রপাত্রীতে সরসতা একটা অতিরিক্ত আস্বাদের কারণ হয়েছে। ভাঁড়ুর ভিলেনি, মুরারির শাঠ্য, কালকেতু বা ফুল্লরার স্বল্পবুদ্ধি অন্ত্যজ আচরণ, শিবের ভোজনলোলুপতা তথা কর্মে অনিচ্ছা সকলই কবির কৌতুকের অংশীদার হয়েছে। এমন কি বনের ভালুক পর্যন্ত এই কৌতুক প্রসারিত।

গুজরাটে নবাগত বৈদ্যসম্প্রদায়ের বর্ণনায় কবির তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টির পরিচয় আছে, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যঙ্গবোধের স্পর্শও লেগেছে।

কারু দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারয়ে সর্বদায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাঁচন করি তবে জীয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে ছলে
সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ॥

পরের চরণে এসেছে ক্লাইম্যাক্স,

বৈদ্যজনের পাশে অগ্রদানীগণ বসে।

বৈদ্যদের চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি কটাক্ষ এখানে বেশ তীব্র।

তবে সাধারণত মুকুন্দরাম ব্যঙ্গরসের রসিক নন। কটু এবং তিক্ত রসে আস্থা নেই তাঁর। মুসলমানদের প্রসঙ্গে ভিন্ন সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কৌতুকই বর্ষিত হয়েছে, আঘাত নয়—

আপন টোপর নিয়া বসিল অনেক মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত।…
আপন তরফ নিয়া বসিল অনেক মিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

মোল্লা পড়ায়ে নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরি মুরগী জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি ॥

অবশ্য মোল্লার নিকা পড়ানো এবং মুরগী জবাই করাকে একই সঙ্গে উল্লেখ করার পেছনে কবির কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে ধর্মবিদ্বেষজনিত বিদ্রূপ প্রকাশ পায় নি। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এদের আচার-আচরণ দেখেছেন, আপনার অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখে যে মৃদু কৌতুক অনুভব করেছেন কবি তাকেই বর্ণনার ভাষায় ধরে রেখেছেন।

স্বশ্রেণীর প্রতিও কবির ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচ্‌ড়া বান্ধে টান ॥

ধনপতির কাহিনীতে দুঃখের ও বেদনার প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। কাহিনীর নিজস্ব ধারাটি কবিকে অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু করুণ রস সৃষ্টি করার দিকে কবি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বা খুব যত্ন নিয়েছেন এরূপ মনে হয় না। ধনপতির দ্বিতীয় বার বিবাহে লহনা যতটা দুঃখ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা দিয়েছে ঈর্ষার জ্বালা। যৌবন অতিক্রমের বেদনা লহনা চরিত্রের ভিত্তিতে থাকলেও দুই সতীনের কলহ ও মারামারির হাস্যকরতার পেছনে তা সুপ্ত থেকেছে। খুল্লনায় প্রণয়-রোমান্টিক রূপের যে সম্ভাবনা ছিল এই কলহপ্রবণতায় তা লুপ্ত হয়েছে। ধনপতির ও শ্রীপতির বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষার কথায় মুকুন্দরামের মৌলিকতা প্রকাশের অবকাশ ঘটে নি। কাহিনীর প্রথানুসরণের চেয়ে বেশি কিছু কবি করতে পারেন নি। কিন্তু বণিকদের বংশমর্যাদার

বড়াইয়ে ষোড়শ শতকের বাণিজ্যগৌরবহীন এই সমাজের অবনতি ও ক্ষুদ্রতার প্রতি কবির তীব্র কটাক্ষপাতে মৌলিকতার স্থর বেজেছে।

মুকুন্দরামের রসিকতার স্বরূপ উদঘাটন করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। "অতি পল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে মিতভাষিতা ও তীব্র ভাস্বরতা, নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধযান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক—এই সমস্তই তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন, সমগ্র প্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধ মার্জিত, জীবনবাদসম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের বহুমুখী বিস্তার হইতে তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।"

মুকুন্দরামের রসিকতা কবির সমগ্র জীবনদৃষ্টি অর্থাৎ বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতাই এই কৌতুকে বহু ধারায় প্রতিফলিত। জীবনের অপরাপর উপলব্ধির সঙ্গে এই রসিকতার কোনো বিরোধ নেই, সহজ সামঞ্জস্য আছে।

কৌতুকরসসৃষ্টিতে মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে পুরাতন বাংলার অপর কয়েকজন কবির সঙ্গে তুলনার বিচারে। মধ্যযুগের বাংলাদেশের অন্তত চারজনের নাম করা যায় যাঁরা মূলত কৌতুকপ্রাণ, প্রাসঙ্গিকভাবে মাত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেন নি। বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র সত্যকার সরস-দৃষ্টির অধিকারী। এই দৃষ্টির আলোতেই জগত এবং জীবনের সত্য তাঁদের কাছে ধরা পড়েছে। অথচ মধ্যযুগের প্রথানুগত্যের জন্য এঁরা কেউই সম্পূর্ণত কৌতুকরসাত্মক কাব্য রচনা করেন নি। তবে ধর্ম ও ভক্তি-প্লাবিত মঙ্গলকাব্য কিংবা আদিরস-উচ্ছসিত কৃষ্ণকাহিনী বা বিদ্যাসুন্দর

উপাখ্যানে ব্যঙ্গ ও রঙ্গের বর্ণসম্পাত বেশ গভীরভাবেই লেগেছে এবং কাব্যকেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিতও করেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আদিরসই মুখ্য আস্বাদ, রাধার চরিত্র-বিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিকতার প্রয়োগই এর প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু কৌতুকহাস্যের বিচিত্র পথ পরিক্রমা করেই কবি প্রেমরসবোধের তথা চরিত্রজিজ্ঞাসার সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষের মূল্য এখানে কম নয়। এ কাব্যে নারদের ভাঁড়ামো স্থূল হাস্যের উপকরণ যুগিয়েছে। নারদচরিত্রের এই জাতীয় ভূমিকা বাংলার লৌকিক সংস্কারের অঙ্গরূপে দীর্ঘকাল আদৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বড়ুর হাস্যরস সৃষ্টির উন্নততর প্রকাশ রাধাকৃষ্ণের রসকলহে। কৃষ্ণচরিত্র কল্পনায়ও বড়ু হাস্যরসকে অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের দেহলোলুপ গ্রাম্য কামুকতা ও তজ্জাত অশ্লীলতা হাস্যসিঞ্চনে আবৃত হয়েছে, সমুন্নতও হয়েছে। 'ঘোড়াচুলা কাহ্নাই' প্রেয়সী নারীকে বশীভূত করতে তার ভার বহন করেছে, মাথায় ছত্র ধরেছে। আবার "মেরে ফেলব, বেঁধে রাখব" বলে মাঝে মাঝে বীর ও রৌদ্ররস প্রকাশ করেছে। মারণ-উচাটন-বশীকরণের আশ্রয় নিতেও ছাড়ে নি। অবশেষে ছলে বলে কৌশলে, জোরজবরদস্তীতে রাধাকে বশীভূত করে নীতিবাক্য উচ্চারণ করেছে বেশ গম্ভীরভাবেই—

তোরে বোঁলো চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী॥

বিজয় গুপ্তের শিবের মধ্যেও ব্যক্তিচরিত্রের কতকগুলি কৌতুককর বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে শিবের স্থানটি একটু বিশিষ্ট। শিব নারদ নয়। যথেষ্ট কৌতুকরসের উৎস হলেও তাকে ভাঁড় হিসেবে আদৌ কল্পনা করা হয় নি। কবিহৃদয়ের সহানুভূতির স্পর্শে শিব চরিত্র-পরিকল্পনা

অন্তত বিজয় গুপ্তের কাব্যে হিউমারের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। শিব দরিদ্র গৃহস্থ। পত্নীবশ হলেও বেশ খানিকটা শিথিলতা তার মধ্যে আছে। বালকের সারল্য এবং চিন্তামুক্ত সদাপ্রফুল্লতা তার ব্যক্তিত্বের চারপাশে একটা লঘু পরিমণ্ডল রচনা করেছে। খেয়া পেরিয়ে সে কড়ি দেয় না। বলদকে বিনা পয়সায় পার করার মতলবে বলে "আমার বলদের গায়ে তুলা হেন ভার।" মেয়ের বিয়ে নিখরচায় সম্পন্ন করার যে অতিবিচিত্র পরিকল্পনা সে করে

হাসি কহে শূলপাণি এয়ো ভাঁড়াইতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইব নেংটা হৈয়া।

তা অশ্লীল হলেও হাস্যগর্ভ।

চাঁদসদাগরের বাণিজ্যবর্ণনায় যে হাস্যরসের কিছু উপকরণ আছে মনসা-মঙ্গলের অনেক কবিই তা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু বিজয় গুপ্ত সচেতন ব্যঙ্গদৃষ্টির সাহায্যে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রঙ্গের আধিক্যে ব্যঙ্গ চাপা পড়েছে, আজগুবির প্রাধান্য উচ্চহাস্যের জন্ম দিয়েছে। বিজয় গুপ্তের যুগে বাঙালির বহির্বাণিজ্য স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। চাঁদসদাগরের পসরায় তাই, মূলো, পান প্রভৃতিরই প্রাচুর্য। অবশ্য তার প্রধান পণ্য বাকচাতুর্য। মসলিনের বদলে তখন চটের থানেরই জয়গান। আর অভিনব ফ্যাসান-লোলুপতা সেকালেও বোধ হয় ছিল একালের মতই প্রবল। এরই মিশ্রণে চটের বসন প্রসঙ্গে যে হাস্যরস উদ্বেল হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা প্রায় একক।

ভারতচন্দ্রের কবিতায় ব্যঙ্গের অতিতীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতকের সমাজ-অবক্ষয়, আদর্শ-বিচ্যুতি ও জীবন-অস্থিরতার পরিবেশ এবং ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন এবং কবিসত্তার বিশিষ্টতার সমন্বয়ে এই ব্যঙ্গদৃষ্টি গঠিত। বুদ্ধির মার্জিত বিচ্ছুরণ এবং ভাষার উজ্জ্বল বক্রতা তাঁর ব্যঙ্গরসের আস্বাদে বিচিত্রতা এনেছে। ভারতচন্দ্র জগত ও জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। মধ্যযুগের ধর্মচেতনা ও ভক্তিপ্লাবন তাঁকে আপ্লুত করতে পারে

নি। মঙ্গলকাব্যের আগ্যাশক্তি দেবতাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন অবৈধ দেহমিলনের অন্যায়কে আবৃত করতে। শিব তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে বেদের বেশ ধরে। বেদব্যাসকে নিয়ে তিনি সরব বিদ্রূপ এবং সরস কৌতুক করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। নারীরূপ বর্ণনায় প্রাচীন কাব্যের পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করেই তিনি তাঁর নায়িকার কটিদেশকে চুলের সঙ্গে এবং বক্ষদেশকে পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে উপমিত করেছেন। কবির কাব্যের আগুন্ত সমাজব্যঙ্গের কটাক্ষপাত ঘটেছে। দক্ষসভায় যজ্ঞ বিনষ্ট হবার প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ও জীবনরক্ষার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্রাহ্মণদের "কেহ কেহ ভোজ্যবস্তু সারিছে" দেখে তিনি উচ্চহাস্য করেছেন।

এই তিনপ্রধানের সঙ্গে মুকুন্দরামের পার্থক্য যেমন স্পষ্ট তেমনি অপরাপর মধ্যযুগীয় কবিদের হাস্যরসসৃষ্টির বিভিন্ন জনপ্রিয় পদ্ধতির তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করবার মত।

এক ॥ মুকুন্দরামের রচনায় কচিৎ ব্যঙ্গ প্রকাশ পেলেও মূলত ব্যঙ্গদৃষ্টির অধিকারী তিনি নন। দুই ॥ মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকাশিত হাস্যরসসৃষ্টির প্রচলিত এবং অতিব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি একান্ত স্থূল বিবেচনায় তিনি পরিত্যাগ করেছেন। নারীগণের পতিনিন্দা বা বণিকপ্রধানের বিপর্যয়ে বাঙাল মাঝিদের ক্রন্দন এরূপ দুটি জনপ্রিয় বিষয়। নারীগণের পতিনিন্দা প্রসঙ্গে অশ্লীলতা, দৈহিক বিকৃতি, নির্লজ্জ কামুকতা এবং বাঙাল মাঝিদের উচ্চারণ বৈক্লব্য কবিরা উপকরণ রূপে ব্যবহার করেছেন। মুকুন্দরামে এদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র। কবির মার্জিতরুচি এরূপ বিষয়ের চর্চায় আনন্দ পায় নি। তিন ॥ আজগুবি ঘটনার সমাবেশে রঙ্গরস তাঁর রচনায় বড় উদ্বেল হয়ে উঠে নি। শুধু পশুপক্ষীদের মানবাচরণে আজগুবি কল্পনার স্পর্শ আছে। চার ॥ কবি ভাষার মারপ্যাঁচে বুদ্ধিদৃপ্ত কৌতুকের জন্ম দেন নি। অবশ্য কচিৎ কোথাও শব্দপ্রয়োগে লীলাবিলাসিতা দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাও অনুচ্চ এবং মৃদুবর্ণ। পাঁচ ॥ ঘটনাসন্ধি বা সিচুয়েশনসৃষ্টির কৌশলে হাস্যরস সৃষ্টি করেন নি মুকুন্দরাম। ঘটনাবিরল এবং পরিবারজীবনের প্রাত্যহিক সামান্য কথায় পূর্ণ

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে অনুরূপ ঘটনাবিন্যাসের সুযোগও ছিল না। ছয় ॥ ঘটনাগত তুচ্ছতা মুকুন্দরামের কৌতুকদৃষ্টির স্পর্শে সরস হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে কৌতুককে মিশিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন কবি। সামান্য দৈনন্দিন ঘটনাও নানা পাত্রপাত্রীর আচরণরূপেই প্রধানত হাস্যের বাহন হয়েছে। ঘটনার মধ্যে এমন কিছু প্রগলভ কলরোল নেই, অসঙ্গত উত্থানপতন বা আজগুবি উপকরণ নেই যাতে হাস্যরস দানা বাঁধতে পারে। বাক্‌বিন্যাসের মধ্যেও এমন শাণিত বক্রতা নেই যা 'উইটের' জন্ম দিতে পারে। বহুব্যবহৃত স্থূল বিকৃত উপাদানও প্রায় বর্জিত হয়েছে। চরিত্রভাবনায় বিকৃতি, মুদ্রাদোষ বা অসংলগ্নতা হাস্যের কারণ হয়ে থাকে। মুকুন্দরাম এক্ষেত্রেও বহুপদপাতে বিবর্ণ পথ ধরে চলেন নি। তাঁর বেশিরভাগ পাত্রপাত্রীই সাধারণ স্তরের মানুষ। এদের অধিকাংশকে আশ্রয় করেই কবির কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য।

তিন ॥ মুকুন্দরামের বাস্তববোধের সীমা

মুকুন্দরামের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ যুক্ত হয়েছে বারবার। তাদের সংখ্যা সুপ্রচুর। এই জাতীয় কাহিনীর সহযোগিতায় কবি নিজ কাব্যকে হয়তো বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মূল কাহিনী এমন একটা বস্তুবোধ ও সরসতার সুরে বাঁধা যে পুরাণ প্রসঙ্গে এসেই বার বার সে সুর কেটে গিয়েছে। তাছাড়া বহু পাত্রপাত্রীর মুখে পুরাণঘটনার উল্লেখ করবার উৎসাহে কবি চরিত্রগত স্বাভাবিকতা বর্জন করেছেন।

তাছাড়া কবির ব্রাহ্মণ্যসংস্কার কখনো কখনো বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করেছে। ব্যাধজীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁর বাস্তবতা মাঝে মাঝে এর ফলে খণ্ডিত হয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

এক ॥ দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম

মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নামে চিহ্নিত কাব্যটিও কিছু অবিশ্বাস্য নয়। অপরাপর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের কাল এবং কাব্য-বিষয়ে এমন সুস্থির তথ্যগত প্রমাণ নেই যাতে তুলনামূলক আলোচনায় কোনো লাভজনক ফলশ্রুতি মিলবে। দ্বিজ মাধবের কাব্যের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিচয়ও ছিল কিনা জানা যায় না। তবুও উভয় কাব্যের তুলনায় মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হবে।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকাব্যটি একান্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ততা অপ্রয়োজনের বর্জনের পথে আসে নি। মঙ্গলকাব্যগুলির আকৃতিগত অতিবিস্তৃতির অন্যতম কারণ প্রাত্যহিক সমাজজীবনের কারণে-অকারণে প্রতিফলন, কতকগুলি বাঁধা-ধরা বর্ণনার অপরিহার্য প্রথানুগ অনুসরণ। কাহিনীর সামান্যতম সূত্র ধরে কবিরা বিবাহ ও স্ত্রী-আচার, বারব্রত, খাদ্য-তালিকা, জাতকর্ম, শ্রাদ্ধকর্ম, পূজাপার্বণের নানা বাস্তব তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। চৌতিশা, বারমাস্যা, কাঁচুলি-নির্মাণ, দেববন্দনার অনাবশ্যক বিস্তারও কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। দ্বিজ মাধব যদি অনাবশ্যককে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ততা আনতেন কাব্যটি সংহত হত এবং কবি প্রথাভঙ্গের শক্তিতে গৌরবান্বিত বিপ্লবী প্রতিভা হিসেবে সম্মানিত হতেন। তিনি তা করেন নি। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রথানুগ বর্ণনা আছে, মূল কাহিনী সংক্ষিপ্ত হয়ে কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ততা দ্বিজ-মাধবের কাব্যের পূর্ণ সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। মুকুন্দরাম কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণদেহ কাব্য গঠন করেছেন। পরিমিতিবোধ কাব্যরচনার গুণ হলেও অতিসংক্ষিপ্ততা আবার রসাভাসের কারণ। অনেকের মতে দ্বিজ মাধবের সংক্ষিপ্ততার প্রধান কারণ কোনো পূর্ব আদর্শের অভাব। এই কাব্যকাঠামোটি তাঁকে নিজেকেই গড়ে নিতে

হয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দরাম কোন্ পূর্বধারার সহায়তা পেয়েছিলেন তাও ভাববার মত। দ্বিজ মাধব সামান্য পূর্ববর্তী কবি হলেও মুকুন্দরাম এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এই কাব্যের কাঠামোটি পেয়েই তাঁর পক্ষে সুঠাম প্রতিমা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহজ নয়। কবিকঙ্কন কবি মানিক দত্ত নামক পূর্বসূরীর নামোল্লেখ করেছেন। সে কাব্য অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিচয় ছিল এমন প্রমাণ নেই। তিনি যে পূর্ণদেহ কাব্যরচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ কবির শিল্পবোধের গভীরতা। দ্বিজ মাধব এই বোধে ন্যূন ছিলেন বলেই গল্প ও চরিত্রের রূপরেখামাত্র তিনি উপস্থিত করেছেন।

দ্বিজ মাধবে কাব্যগঠনের অন্যতম মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে 'বিষ্ণুপদ' আখ্যাত কতকগুলি কবিতার ব্যবহারে। এর দ্বারা সম্ভবত আখ্যানধর্মের সঙ্গে গীতিরস যুক্ত করতে চেয়েছেন কবি, মঙ্গলকাব্যের বস্তুভারাক্রান্ত বর্ণনরীতিকে কিছুটা সুরের ডানা দিতে চেয়েছিলেন। কবির উদ্দেশ্য মহৎ। কাব্যগঠন-রীতিতে এই নবপরীক্ষা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু প্রযুক্তিতে আদ্যন্ত সাফল্য আসে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গীতিকবিতাটি বর্ণিত প্রসঙ্গের সঙ্গে এতই অসঙ্গতভাবে সংশ্লিষ্ট যে রসিকমন পীড়িত হয়ে পড়ে।

মুকুন্দরামও ঠিক একই উদ্দেশ্যে—মঙ্গলকাব্যের একঘেয়ে বস্তুভারস্থবির বর্ণনায় কিছু বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য—কয়েকটি গীতিকবিতা সংযুক্ত করেছেন। গীতিআবেদনের প্রতি কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল না, খুল্লনার কণ্ঠে বসন্ত, শুক প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করে যে বিরহপদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা আখ্যানকাব্যে রীতিঘটিত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য। হয়তো মুকুন্দরাম তাঁর কাহিনীর সাধারণ বর্ণনভঙ্গিতে এই জাতীয় বিরহব্যাকুলতা প্রকাশের অক্ষমতার কথা মনে মনে অনুভব করেছিলেন। কাব্যের এই একটিমাত্র স্থানে শুধুমাত্র নায়িকার বিরহার্তি প্রকাশের সুযোগ করে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন।

উভয়েই প্রায় অভিন্ন উদ্দেশ্যে একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সংযত শিল্পবুদ্ধির তারতম্যের জন্য ফলশ্রুতিতে পার্থক্য ঘটেছে।

দ্বিজ মাধবের সঙ্গে কবিকঙ্কনের একটা বড় পার্থক্য দেবখণ্ডের কাহিনী নির্বাচনে। মঙ্গল দৈত্যকে বধ করে চণ্ডী কিভাবে মঙ্গলচণ্ডী হলেন সম্ভবত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শে মাধব সে কাহিনী বিবৃত করেছেন। মুকুন্দরাম দক্ষযজ্ঞের ও শিবের কামভস্মের বর্ণনা সেরে শিব-পার্বতীর পারিবারিক জীবনের কৌতুকমিশ্রিত মনোহর ছবি এঁকেছেন। মুকুন্দরাম আপন প্রবণতার কেন্দ্রটি চিনতেন। তাই শেষ পর্যন্ত পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক ছোটখাট সুখ-দুঃখের সকৌতুক বর্ণনায় পৌঁছে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এ জাতীয় সচেতন নির্বাচন দ্বিজ মাধবে কেন, মধ্যযুগের খুব কম কবির কাছেই প্রত্যাশিত।

দ্বিজ মাধবের বাস্তবতা কোনো কোনো মহলে প্রশংসিত হয়েছে। আবার মুকুন্দরামের তুলনায় তাঁর বাস্তবতাকে অনেকে বস্তুর ভার বলেছেন, বাস্তব-রসের সিদ্ধি বলে স্বীকার করেন নি। বাস্তবতার দিক থেকে দুজনের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং তা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, মুকুন্দরাম ব্যাধ-জীবনের চিত্রে ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের আরোপ করেছেন, দ্বিজ মাধব ব্যাধসমাজের চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, পৌরাণিক কাহিনী-কথনে মুকুন্দরামের কিছু বেশি উৎসাহ ছিল। এই বিষয়ে ঘটনাসন্ধি বা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা সর্বদা দেখাতে পারেন নি কবি। ফলে শৈল্পিক বাস্তবতা কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হয়েছে। মাধবের বাস্তববোধ কবিচিত্তের সর্ববিধ ব্যক্তিক প্রবণতামুক্ত। তৃতীয়ত, মুকুন্দরামের সৃষ্টিতে বাস্তব জীবনচিত্র কৌতুকরসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশিষ্ট স্বাদুতা নিয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে দ্বিজ মাধবে সত্যই বস্তুর ভার যতটা বস্তুনিষ্কাশিত রস ততটা নেই।

দুই ॥ কালিদাস এবং মুকুন্দরাম ॥

কালিদাস এবং মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার মধ্যে এমন কোনো সাদৃশ্য নেই। কিন্তু

মুকুন্দরাম শিব-পার্বতী কথা কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ের আলোচনায় কবিদ্বয়ের কিছুটা তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

হিমালয় পর্বতে শিবের ইন্দ্রিয়নিরুদ্ধ তপস্যা, তারকবধের জন্য শিবকে কামাতুর করে তুলতে ইন্দ্রকর্তৃক মদনের সাহায্য প্রার্থনা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম কুমারসম্ভবের অনুসরণ করেছেন। দ্বিজ মাধবে এই সব বিষয়ের উল্লেখমাত্র নেই। পূর্ববর্তী অপরাপর মঙ্গলকাব্যেও স্বর্গখণ্ডে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্থান পায় নি। কবি মুকুন্দরামই প্রথম শিব-পার্বতীর বিবাহ-কথাকে চণ্ডীকাব্যে স্থান দিলেন, বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব আমন্ত্রিত হল। কবি যে কালিদাসের সোজাসুজি অনুসরণ করেছেন বহু শ্লোকের সাদৃশ্য দেখিয়ে সে-কথা অনায়াসে প্রমাণ করা যেতে পারে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে কামের সম্মোহনবাণক্ষেপণ বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ
ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরৌষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥

... ...

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ
পুনর্ব্বশিত্বাদ্বলবান্নিগৃহ্য।
হেতুং খচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষু
র্দিশামুপান্তেষু সসর্জ্জদৃষ্টিম্ ॥

স দক্ষিণাপাঙ্গং নিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুগ্যতমাত্মযোনিম্॥
তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যো
ভ্রূভঙ্গংদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়া
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি!
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥

মুকুন্দরামে আছে—

ধেয়ানে আছেন শিব অজিন আসনে।
ঝারি হাতে আছে গৌরী তার সন্নিধানে॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধ্যানভঙ্গ হয়ে শিব চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ॥
কোপ-দৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥

রতিবিলাপের নিম্নোদ্ধৃত অংশেও কুমারসম্ভবের নিশ্চিত প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

কুমারসম্ভব; ৬৬, ৬৭, ৬৯-৭৩ তম শ্লোক; তৃতীয় সর্গ।

চণ্ডী ॥ কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তলভার ত্যজে নানা অলঙ্কার ॥
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ।।

কুমারসম্ভব ॥ অথ সা পুনরেব বিহ্বলা
বসুধালিঙ্গনধূসরাকৃতিঃ।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা
সমদুঃখামিব কুর্ব্বতো স্থলোম্ ।।*

চণ্ডী ॥ ভুবন সুন্দর-তনু তোমার কুসুমধনু
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
লুটায় ধরণীতলে মম পাপ-কর্মফলে
সুকঠিন বিধাতার প্রাণ ।।

কুমারসম্ভব ॥ উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশৃশোং দশাং
ন বিদীর্য্য কঠিনাঃস্ত্রিয়ঃ ।।

চণ্ডী ॥ এই হর-কোপানলে তোমারে দহিল বলে
না বধিল রতির জীবন।
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রহিল গঞ্জন ।।

কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক।

কুমারসম্ভব ॥ মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনোয়মিদং ব্যবস্থিতং
রমণ ত্বামনুয়ামি যদ্যপি ॥*

কালিদাসের কাব্যের পঞ্চম সর্গে গৌরীর তপস্যার বর্ণনা আছে। মুকুন্দরাম বাইশ চরণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণ খুবই স্বল্প, কিন্তু এ যে কালিদাসের বর্ণনারই সংক্ষিপ্তসার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কে তো যথাযথ অনুবাদ। যেমন—

চণ্ডী ॥ পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধ মুখ করি রহে অরুণ-মণ্ডলে ॥

কুমারসম্ভব ॥ শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥**

চণ্ডী ॥ শিব-পদ-ধ্যান গৌরী কৈল অনুক্ষণ।
বৃক্ষের গলিতপত্র করিল ভক্ষণ ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান ॥

কুমারসম্ভব ॥ স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্ত্বয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥§

* কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গের ২১ তম শ্লোক।
** কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের ২০ তম শ্লোক।
§ কুমারসম্ভব পঞ্চম সর্গের ২৮ তম শ্লোক।

মুকুন্দরাম কালিদাস থেকে গ্রহণ করেছেন। ঘটনাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, বর্ণনাংশ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। পুষ্পাস্ত্র সজ্জিত কামদেব রতিসহ তপস্যাজীর্ণ কাননে প্রবেশ করলেন। অকাল বসন্তের বর্ণবহুল, যৌবনরক্ত তরঙ্গিত সেই বর্ণনা সামনে থাকা সত্ত্বেও মুকুন্দরামকে ব্যাকুল করে নি, আকর্ষণ করে নি। একটি চরণে ঘটনাটির উল্লেখ করেই কবি তৃপ্ত থেকেছেন। নবযৌবনমুকুলিত উমার প্রণয়বিহ্বল চিত্তে, সৌন্দর্যমাধুর্য চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে তপস্যাভূমিতে প্রবেশ কালিদাসের কাব্যকে ইন্দ্রিয়োদ্বেল করে তুলেছে। মুকুন্দরাম সেবাপরায়ণা উমার উল্লেখমাত্র (বর্ণনা নেই, ছবি নেই) করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। মদনভস্মের যে নাটকীয় মুহূর্তটি অমর হয়ে উঠেছে কুমারসম্ভবে (৩।৬৩) তা মুকুন্দরামের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

রতিবিলাপ বর্ণনায় কালিদাসও কারুণ্যের গভীরে প্রবেশ করেন নি। রূপমুগ্ধ বিলাসী মনের নাগর বাক্‌পটুতা বেদনার তীব্রতাকে আচ্ছন্ন করেছে। মুকুন্দরামের সুরেও দুঃখ নেই। কিন্তু সৌন্দর্যবক্রতার আস্বাদও নেই। কালিদাসের রতিবিলাপ আসলে 'রতি'র বিলাপ। মুকুন্দরামে বিলাপ যেমন শূন্যগর্ভ, রতিও তেমনি শুধু ভাবেই আছে, সুরে, রসে, ছবিতে নেই।

উমার তপস্যা কুমারসম্ভবের একটি বিশ্ববিশ্রুত বর্ণনাংশ। কালিদাস উমার কৃচ্ছ্রসাধনের, কঠিন তপস্যার কথা বলেছেন। রুদ্র গ্রীষ্মে, নিষ্করুণ হিমে, অনশনে অর্ধাসনে যে সাধনা শিবলাভের তার ভাব-ভিত্তিতে ছিল ইন্দ্রিয় আবেদন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বচারী হবার বাসনা। কিন্তু কালিদাসের বর্ণবস্তু ভাষারূপে বিস্ময়কর হয়ে পুষ্পিত হয়েছে ইন্দ্রিয়সৌন্দর্যের বিচিত্র বিহ্বলতা, বল্কলবদ্ধ বালারুণসদৃশ পয়োধরে, জটাগ্রন্থিত মঞ্জুকেশের পটভূমিতে শৈবালাচ্ছাদিত পঙ্কজবৎ মুখসৌন্দর্যে, লতায় অর্পিত তন্বী দেহের বিলাসহিল্লোলে, মৃগে সমর্পিত বিলোলদৃষ্টিতে যে স্বাহুতা তা রূপরসগন্ধস্পর্শের জগতের। সৌন্দর্যসৃষ্টির এই পৃথিবীতে মুকুন্দামের প্রবেশ নেই। সুন্দরের এই মূর্তি দেখার চোখই তাঁর নেই। কালিদাসে-মুকুন্দরামে তাই নৈকট্য নেই কোথাও। সংক্ষিপ্ত বিবরণে

উমার তপস্যাজগত থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। অত্যল্পকাল মধ্যে উমা-মহেশের দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিক সুখদুঃখের কথা এসেছে। কবির কৌতুকদৃষ্টি মুক্তি পেয়েছে।

তিন ॥ মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র ॥

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের ধারায় সব চেয়ে বিশিষ্ট কবি হলেন মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র। এঁদের কবিপ্রতিভা এবং কাব্যরচনবৈশিষ্ট্য বহু তুলনার বিষয় হয়েছে।* এঁদের দুজনের জীবনকথা এবং কবিদৃষ্টির মূল স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা করেছি। চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গলের সদৃশ বিষয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য কতটা প্রতিফলিত হয়েছে এবার তার বিচার করা যাক।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের কোনো কোনো বিষয় মুকুন্দরাম থেকে প্রত্যক্ষত গ্রহণ করেছেন। এ জাতীয় গ্রহণ সেকালে নিন্দিত হত না। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের ভাবনাভঙ্গি ও বর্ণনারীতির নবীনতা পুরাতন বিষয়কেও একেবারেই অন্য রূপ ও রসাবেদনের বাহন করে তুলেছে।

অবশ্য এমন যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে ভারতচন্দ্র এবং মুকুন্দরাম উভয়ই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পুরাণ থেকে এবং কামভস্ম ও শিববিবাহের বিষয় কালিদাস থেকে গ্রহণ করেছেন। একই উৎস থেকে সঙ্কলিত বলে দুটি কাব্যে বিষয়গত এই সাদৃশ্য। একে ঋণ বলা অনুচিত। এ যুক্তি মানা যায় না। কারণ পৌরাণিক কাহিনীর বিপুল বিস্তার ও বহুল বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে ভারতচন্দ্র ঠিক সেই অংশটুকুই নির্বাচন করলেন যা আগেই মুকুন্দরাম কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। কুমারসম্ভব কাব্য নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রের ভালো করে পড়া

* জীতেন্দ্র নাথ বসুর "মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র" নামক গ্রন্থ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছিল। কিন্তু যেটুকু সঙ্কলিত হয়েছিল কবিকঙ্কণচণ্ডীতে, সেইটুকুই নির্বাচন করার মানে নিশ্চিতভাবে পূর্বসূরীর ঋণগ্রহণ।

দেবখণ্ডের কাহিনী পরিকল্পনায় মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ অনুসরণ দেখা যাবে অন্নদামঙ্গলে। দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ; শিবতপস্যা, মদনভস্ম ও শিবউমা-বিবাহ; হর-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ, দারিদ্র্য ও হরের ভিক্ষাবৃত্তি এই পর্যন্ত উভয় কবির কাহিনী অংশে বড় অমিল নেই। কিন্তু তার পর থেকে পার্বতী চণ্ডীর রূপ নিয়ে পূজা প্রচারের চেষ্টা শুরু করলেন মুকুন্দরামে, আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁর অন্নদারূপে প্রকাশ ঘটল কাশীধামে। কাহিনীগত ঐ ঐক্যই উভয়ের শিল্পীপ্রবণতার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলেছে।

প্রথমত, পরিবারতন্ত্রের কবি মুকুন্দরাম বাঙালি দাম্পত্য জীবনের একান্ত স্বাভাবিক রূপই ফুটিয়ে তুলেছেন সতীর বিনা-নিমন্ত্রণে পিত্রালয়-গমন প্রসঙ্গে। শিব কিছুতেই তাঁকে অনুমতি না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধ হয়ে একাকিনী দক্ষালয়ে চললেন। নিরূপায় শিব বৃষভ সহ নন্দীকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর বর্ণবহুল চিত্ররচনক্ষমতা তথা নাটকীয় চমকপূর্ণ উপস্থাপনরীতি প্রযুক্ত করেছেন এই প্রসঙ্গে। আদ্যারূপিণী সতী দশমহাবিদ্যার রূপে মহাদেবকে বিস্মিত ব্যাকুল করে তুললেন। দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ রেখা ও রঙের সুষ্ঠু প্রয়োগে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। চলচ্চিত্রের ছবির মত দ্রুত পরিবর্তনশীল এই মূর্তিগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি মহাদেবের ভীতত্রস্ত দৃষ্টির বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, সতীর তনুত্যাগের সংবাদে মুকুন্দরামের শিব সরলচিত্ত বালকের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উচ্চৈস্বরে কেঁদেছে—

অশ্রুমুখে বার্ত্তা কহে নন্দী মহেশ্বরে।
লোটায়ে কান্দয়ে রুদ্র মহীর উপরে॥
সতী সতী করিয়া আকুল শূলপাণি।
ত্রিজগৎ-নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী॥

কিন্তু শিবের ক্রোধভয়ঙ্কর যে রূপ মুকুন্দরাম আঁকতে চেয়েছেন তা আদৌ বর্ণবস্তু হয়ে ওঠে নি। ভারতচন্দ্র আবার শিবের শোককাতর মূর্তি আঁকায় বিশেষ উৎসাহ পান নি। 'শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর বিস্তর কৈলা রোদন' বলেই কবি রুদ্ররূপী শিবের দক্ষালয় যাত্রার এক বিস্ময়কর ছবি এঁকেছেন। শব্দের ঝঙ্কারে ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি বিভিষিকা-ঘেরা এক রুদ্রগম্ভীরের রাজ্যে পাঠককে নিয়ে যায়—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
... ...
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
আরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

সতীহারা শিবের বেদনার আন্তরিকতা নয়, রুদ্রের ভীষণ রূপরচনায় প্রসাধন কলার সার্থক প্রয়োগই ভারতচন্দ্রের লক্ষ্য।

তৃতীয়ত, শিবের অনুচরদের দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করার চিত্রে দুই কবিই ভৌতিক কোলাহলের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় যেন কবিকণ্ঠের উত্তেজিত উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। মুকুন্দরামে বস্তুনিষ্ঠা অনেক স্পষ্ট। বড়জোর স্মিত হাস্যে কবিচিত্ত ঘটনা-বর্ণনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে।

ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
পৈতা দেখাইয়া কান্দে।

এইরূপ দুএকটি প্রসঙ্গে সংযত কৌতুক প্রকাশ না করে পারেন নি কবিকঙ্কণ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লসিত তুণক ছন্দে একটা মহা হুলুস্থূল কাণ্ড ঘনিয়ে তোলা হয়েছে। সাজানো যজ্ঞ বিপর্যস্ত হওয়ায়, অভিজাত দেবতা ও ঋষিদের গৌরবচ্যুতির ঘটনায় কবিচিত্তে এক ধরনের বিকৃত আমোদের উত্তেজনা দেখা

দিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গরস।

বিপ্র সর্ব্ব , দেখি খর্ব্ব
ভোজ্যবস্তু সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ
লাথি কিল মারিছে ॥

চতুর্থত, শিবের ধ্যানভঙ্গের জন্য কামের আগমন ঘটেছে পুষ্পধনু হাতে। সেই আবির্ভাবে তপস্যাজীর্ণ বনস্থলীতে অকাল বসন্ত সমাগমের চিত্রধন্য বর্ণনায় (মধুদ্বিরেফ কুসুমৈক পাত্রে ইত্যাদি) কালিদাসের কাব্যের একটি বিস্তৃত অংশ অপরূপ হয়ে আছে। মুকুন্দরাম একটি মাত্র চরণে কর্তব্য সেরেছেন ("দণ্ডমাত্র গেলো বীর যথা পঞ্চানন"), চিত্ররচনার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। ভারতচন্দ্র অবশ্য খুব সংক্ষিপ্ত একটি ছবি এঁকেছেন—

সম্মুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত
কোকিল ভ্রমর সাথে ॥
মলয় পবন বহে ঘনে ঘন
শীতল সুগন্ধ মন্দ ॥
তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ ॥

কিন্তু এ ছবি যেমন মামুলী তেমনি বিবর্ণ। অথচ সামনে চিত্ররচনার বড় আদর্শ ছিল। আসলে প্রকৃতি-সৌন্দর্যের, কোমল-মধুরের চিত্রাঙ্কনে ভারত-মুকুন্দ দুজনেরই উৎসাহের অভাব। শক্তির যে অভাব ছিল না তার প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্রের চিত্রণ ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। অবশ্য মুকুন্দরামও শক্তিহীন ছিলেন না। কিন্তু বক্র ব্যঙ্গ দৃষ্টি সুন্দর সম্পর্কে নির্মোহ করে তুলেছিল ভারতচন্দ্রকে, তিনি চাতুর্যকে যতটা চেয়েছিলেন, মাধুর্যকে ততখানি নয়। মুকুন্দরামও কৌতুকাত্মক, কিঞ্চিত কিম্ভূত জীবনরসের রসিক ছিলেন। রোমান্টিক শিল্পীর সৌন্দর্যমুগ্ধতা ছিল না তাঁর চোখে, জীবনের সেই অসঙ্গতিটুকু

তিনি ঠিকই দেখেছিলেন আবেগের আসক্তি না থাকলে যেটুকু দেখা যায়।

ভারতচন্দ্র কামের তীরসন্ধানের কালে গৌরীকে হরের নিকটে রাখেন নি। মুকুন্দরাম কালিদাসের অনুসরণে গৌরীর সামনেই কামভস্ম করিয়েছেন, গৌরীকে পাঠিয়েছেন তপস্যায়। যদিও কালিদাস এই উপস্থিতিকে যেভাবে নাট্যতাৎপর্যে মণ্ডিত করেছিলেন মুকুন্দরাম তা অনুধাবন করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্র এই দৃশ্যপট থেকেই গৌরীকে বাদ দিয়েছেন। কামের মধ্যে যে পরম নেই, তপস্যায় পেতে হয় প্রেমকে এই উপলব্ধির কিছুমাত্র মূল্য ছিল না ভারতচন্দ্রের কাছে। তিনি কামভস্মের পরে মহাদেবের যে ছবি এঁকেছেন তা একেবারে মৌলিক—

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তলাসিয়া
ফিরে সকল স্থানে॥

ভারতচন্দ্র হয়ত দেবমাহাত্ম্যকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন এখানে। তবে কাম মরেও মরে না, মানবের অস্তিত্বের মূলে তার বাস এমনি একটি বিশ্বাস ভারতচন্দ্রের ছিল। তার প্রতিফলন এখানে ঘটা অসম্ভব নয়। অনেকেই অবশ্য এখানে ভারতচন্দ্রের রুচি বিকার তথা আদি রসের অতিরেকের পরিচয় পেয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপ বহু নিন্দিত কবিতা। সত্যই অত্যন্ত হীন স্তরের দ্যোতক ছলাকলাই এখানে প্রধান। কিন্তু মুকুন্দরামের রতিবিলাপেও বেদনার আন্তরিকতা কিছুই প্রকাশ পায় নি। এমন কি স্বয়ং কালিদাসেও এ অংশে বিলাপ আছে নামে, রতির বিলাপ বলেই এর যা-কিছু আকর্ষণ।

পঞ্চমত, শিবপার্বতীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট দাম্পত্যজীবনের বর্ণনায় মুকুন্দরাম পরিবাররস এবং সরসতার সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিবের ভোজনলোলুপ ও কর্মবিমুখ অলসতা তথা বালসুলভ সারল্য কৌতুককে চরিত্রাশ্রয়ী করে

তুলেছে। শিবপার্বতী কলহেও বাস্তব জীবনের রূঢ়তা কৌতুকহাস্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে মুকুন্দরামের রচনার গুণে। ভারতচন্দ্রের শিবপার্বতী-দ্বন্দ্বে আদি রসাত্মক ইঙ্গিতের বাড়াবাড়ি আছে। মানবরসের সহজ প্রকাশের স্থানে ভাষাভঙ্গির প্রসাধন নৈপুণ্যের দিকে কবির লক্ষ্য বলে মনে হয়।

ষষ্ঠত, মুকুন্দরাম ধনপতি-আখ্যানে লহনা-খুল্লনা দুই সতীনের তীব্র কলহের ছবি এঁকেছেন। এই ঝগড়া মারামারিতে গিয়েও দাঁড়িয়েছে। খুল্লনার ছাগল চরানো এবং অন্যান্য নানাভাবে উৎপীড়িত হবার কাহিনী বর্ণনা করেছেন কবি। কিন্তু লহনার চরিত্রভাবনার বৈশিষ্ট্য এই দ্বন্দ্বকে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। ভারতচন্দ্রের চরিত্রপরিকল্পনায় মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণের যেমন অভাব, তেমনি আদ্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পাত্রপাত্রী গড়ে তোলবার চেষ্টাও বড় লক্ষিত হয় না। ভবানন্দের দুই রাণী পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী দুটি জীবন্ত নারীচরিত্র হয়ে ওঠে নি। লহনার আদর্শে চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরিকল্পিত। কিন্তু লহনার ন্যায় বিগত যৌবনের জ্বালা ও ঈর্ষা তার চরিত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত নয়। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা শুধুই আদিরসাত্মক ইঙ্গিতের উপকরণরূপে ব্যবহৃত। তাদের কলহে ভারতচন্দ্র কিছু আমোদ পরিবেশন করেছেন, উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। দুই স্ত্রী নিয়ে স্বামীর বিড়ম্বনাকে বিদ্রূপ করেছেন—

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

ভারতচন্দ্র এবং মুকুন্দরামের শিল্পী-চিত্তের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে যে পার্থক্য তা-ই উভয়ের কাব্যের সদৃশ বিষয়গুলিকে উপস্থাপনার দিক থেকে এতখানি দূরে নিয়ে ফেলেছে। সমগ্রত "কবিকঙ্কণচণ্ডী" এবং "অন্নদামঙ্গলে"র মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে তুলনা করা চলে। এক। মুকুন্দরাম সাধারণ নরনারীর চরিত্রচিত্রণে উচ্চাঙ্গের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত সুপ্রচলিত এবং স্বাভাবিক সামাজিক ও ব্যক্তিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাঁর

কাব্যের মানুষেরা স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রে চরিত্রচিত্রণ জীবনমুখী নয়। গোটা মানুষ গড়ে তুলতে চান নি তিনি। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ "মুডে"র স্থির বা গতিশীল চিত্র এঁকেছেন, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি, আগুন্ত সঙ্গতিবিধানে দৃষ্টি দেন নি। দেবতাকে তিনি মুকুন্দরামের মত পুরোপুরি মানুষ করে তোলেন নি। তাদের দেবত্ব কতকাংশে বজায় রেখেছেন, তাত্ত্বিকতার উল্লেখ করেছেন বারবার, আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাদের হীনতা সূচিত করতে দ্বিধা করেন নি। ভারতচন্দ্রের পাত্রপাত্রীরা বহুক্ষেত্রেই শুধু ব্যঙ্গভাবনার অবলম্বন, কখনও বাস্তবতার ক্যারিকেচার। কবির বিশেষ জীবনভাবনারই এরা বাহন। দুই। মুকুন্দরাম এবং ভারত-চন্দ্রের বাচনভঙ্গির মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। এই পার্থক্যের কারণও এঁদের শিল্পীব্যক্তিত্বের উৎস পর্যন্ত প্রসারিত। ভারতচন্দ্রের ভাষা অতিমাত্রায় প্রসাধিত। শব্দচয়নে, অলঙ্করণে, ছন্দ ব্যবহারে কবি অতিসচেতন। কবির বাচনভঙ্গি ভাবকল্পনাকে ছাপিয়ে একাগ্র হয়ে উঠেছে। তাতে নৈপুণ্য আছে, পাণ্ডিত্য আছে, রীতিঘটিত সৌকর্য বিধানের দুর্লভ পরিচয় আছে। পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে তার আবেদন অনিবার্য। কিন্তু চারুশিল্পের চরম পরীক্ষা যে ভারসাম্যে তাতে কবি উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। আর মুকুন্দরামের রচনারীতির প্রধান কথা এই ভারসাম্য।

চার ॥ মুকুন্দরাম, ক্র্যাব, চসার ॥

মুকুন্দরামের সঙ্গে ইংরেজ কবি ক্র্যাবের* তুলনার প্রশ্ন আসছে কাউয়েল সাহেবের একটি মন্তব্য থেকে। তিনি বাস্তবতার দিক থেকে কবিকে ভারতীয়

* George Crabbe [1754-1832] "Crabbe's early life was spent in Suffolk where his father was a customs official, but after an unsuccessful attempt at medical practice he came to London to live by writing. Soon almost destitute, he was befriended by Burke who helped him to publish, introduced him into Johnson's circle

ক্র্যাব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, "It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description. Our author is the Crabbe among Indian poets and his work thus occupies a place which is entirely its own."

ক্র্যাবের সঙ্গে সাধারণভাবে মুকুন্দরামের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাস্তববাদী কবি হিসেবে দুজনেই প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন, কল্পনারঞ্জিত রহস্যমণ্ডিত কোনো অজ্ঞাত লোকের কামনায় পক্ষবিধূনন করেন নি। কিন্তু বাস্তবতার রূপভেদ শ্রেণীভেদ আছে, সেখানেই এঁদের আসল পার্থক্য। প্রকাশভঙ্গিতে এঁদের দুজনের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সচেতন ও সুতীক্ষ্ণ শব্দবোধ এঁদের কারুরই ছিল না, ইন্দ্রিয়ানুগ সৌন্দর্য ভাবনায়ও এঁরা কেউই ব্যাকুল হন নি। বাস্তবকে রূপায়িত করার বাসনায় প্রথানুগ ক্লাসিকরীতির বাচনভঙ্গিই এঁরা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এ মিলে আপাতদৃষ্টি মুগ্ধ হবে। জীবনঅভিজ্ঞতার কতকটা ঐক্য এবং অন্তরাত্মার মৌলিক অনৈক্য এঁদের শিল্পীপ্রতিভাকে একেবারে স্বতন্ত্র করে ফেলেছিল। উত্তরজীবনে অভিজাত পরিবারের সংস্পর্শ ও সাফল্যলাভ হলেও প্রথম জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ক্র্যাবের মনের সব সরসতা মুছে দিয়েছিল, তাঁকে করে তুলেছিল, জীবন সম্পর্কে হতাশ, মানুষের প্রতি সহানুভূতিহীন তিক্ত মনের অধিকারী। অপরপক্ষে দুঃখ-দারিদ্র্যও মুকুন্দরামকে জীবনবিমুখ করে নি। বার্ধক্য পর্যন্ত কাব্যরচনার

and encouraged him to take orders. He became chaplain to the duke of Rutland and later rector of Trowbridge......Grimly realistic in outlook, he described the Suffolk life and landscape he knew, with minute attention to detail and a sense of character. If his imaginative scope was limited and his satire monotonous in its dark pessimism, his poetry gained force and directness from his courageous fidelity to fact and scorn of facile sentimentality."—Encyclopædia of Literature, Vol. 1.

সুযোগ না পেয়েও পৃথিবী, মানুষ, সমাজ সম্বন্ধে তিনি বিরক্ত হন নি, সরসতার এক অনন্ত উৎস ছিল তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে। হাসি দিয়ে তিনি জীবনকে জয় করেছিলেন। তাই ক্র্যাবের শিল্পীদৃষ্টির সঙ্গে মুকুন্দরামের রয়েছে গোড়াকার পার্থক্য। ক্র্যাবের গম্ভীর বিরস বাস্তবতা, তীক্ষ্ণ কিন্তু একঘেয়ে ব্যঙ্গ এবং বিবর্ণ নৈরাশ্যবাদের অধিকারী নন মুকুন্দরাম। সস্তা ভাবালুতার বিরুদ্ধে ক্র্যাবের আঘাত ছিল তীব্র, সাফোক অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্যগত নিখুঁত পরিচয় উপস্থাপনে, এমন কি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাঁর নিষ্ঠা ছিল সুকঠিন। মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যবিধান করা চলে না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দূরত্ব বোঝাবার জন্য বলেছেন, "সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া দেখাইয়াছে, ক্র্যাবের কবিতা তাহারই প্রতিবাদ ; কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রাণকেন্দ্র কোথায় তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি বাস্তব রসের কবি নহেন।"

যেখানে ক্র্যাবের সঙ্গে মুকুন্দরামের পার্থক্য সেখানেই চসারের* সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। চসারের সঙ্গে কবির সাদৃশ্যের কথাও কাউয়েল বলেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দেশের ভিন্নকালের এই দুই কবির মধ্যে অজস্র অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যের কেন্দ্রটি কোথায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

চসার রাজসভার খ্যাতিমান সভাসদ ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় কার্যে বহুদিন কাটিয়েছেন, ঘটনাবহুল এবং উত্তেজিত জীবনযাপন করেছেন।

---

* Geoffry Chaucer [1340-1400]—"As a youth he was a page in the royal household of Lionel, afterwards duke of Clarence. When serving in the 1359-60 French campaign he was captured and ransomed Afterwards he held various diplomatic and civil posts......His most celebrated works are 'The Canterbury Tales' and 'Troilus and Criseyde.'"—Encyclopædia of Literature, Vol. 1.

অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে গ্রাম্য জমিদার কাছারীর স্বল্প অভিজ্ঞতা ও নিস্তরঙ্গ-জীবনের কবিকঙ্কণের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। চসার সম্পর্কে ড্রাইডেন বলেছিলেন " 'Tis sufficient to say, according to the proverb that 'here is Gods' plenty.' " সৃষ্টির যে বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করে Neville Coghill বলেছেন, " It is the concise portrait of an entire nation, high and low, old and young, male and female, lay and clerical, learned and ignorant, rogue and righteous, land and sea, town and country, but without extremes."—(Introduction to The Canterbury Tales) মুকুন্দরামে তা যেমন নেই, তেমনি মিলবে না চসারের মার্জিত বাক্ বৈদগ্ধ্য, নাগর বচন-বিন্যাস, তির্যক কটাক্ষ, বুদ্ধিদৃপ্ত রম্যরস।

কিন্তু চসারের রচনার উল্লিখিত সব কিছু লক্ষণের উৎস যে শিল্পীমন তাঁর সঙ্গে মুকুন্দরামের কবিচিত্তের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। E. Legouis চসারের সেই শিল্পীমানসের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "It is well known how dry, morose, and bitter such reproduction of reality can be. It may breed disgust with life and men. Chaucer without flattering his model, placed it in an atmosphere which is good to breathe. No one can read him and not be glad to be in the world." এই জিনিসটি হল সেই সরসতা, সুখ-দুঃখ, লঘুতা-গাম্ভীর্য সব কিছুর সঙ্গেই যা সহজে মিলে যেতে পারে, কবিকঙ্কণে যার পরিচয় পাওয়া যাবে প্রতি পদক্ষেপে। E. Legouis আরও বলেছেন, "It evinces a weakening of the passion which leads to lyricism or satire and is supported by self-confidence and by the energy of desires, hopes, loves, and hates ; a weakening also of the imagination which transforms and magnifies reality...

In the Canterbury Tales the element of the poet's personality has been subdued, superseded by pleasure in observing and understanding." (History of English Literature)। মুকুন্দরাম সম্পর্কেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। পার্থক্য মাত্রাগত। এই "pleasure in observing and understanding"-এর সূত্রেই বস্তু রূপান্তরিত হয় বাস্তব রসে। এর গুণেই মুকুন্দরাম বাস্তব রসের কবি।

চতুর্থ অধ্যায়

এক ॥ তিন কাহিনী, এক কাব্য ॥

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কবির নিজস্ব কল্পনার ফল নয়। ঐতিহ্যের ধারায় প্রাপ্ত কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করাই ছিল প্রথা। তার মধ্যে কোনো লেখক আপন প্রতিভা এবং জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতার জোরে কতটুকু নবীনতা এনেছেন তা প্রায় শ্যেনদৃষ্টি অনুসন্ধানের বিষয়।

মুকুন্দরাম শক্তিশালী কবি। মঙ্গল কবিগোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। কাহিনী গঠনে চণ্ডীমঙ্গলের ঐতিহ্যের মধ্যেই তিনি কিছু অভিনবত্ব, কিছু নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। গল্পরসের দিক থেকে চণ্ডীমঙ্গলের তুলনামূলক দুর্বলতার কথা আগেই বলেছি। কবি তা জেনেই এই কাহিনীর বিশেষ অভাব আর সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে একে নির্বাচিত করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে আগে কিছু বলা হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী আছে। স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ। একে অপরের উপরে নির্ভরশীলও নয়। ধর্মমঙ্গলের বহু যুদ্ধ ঘটনাকে কয়েকটি খণ্ড কাহিনী হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তারা এক লাউসেনেরই কীর্তি, লাউসেন-মহামদের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় গ্রথিত হয়েছে। তারা বহু ঘটনা নিয়ে গাঁথা একটিই মালা। মনসামঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও উপকাহিনী বিশেষ বিস্তৃতি পেয়ে স্বতন্ত্র কাহিনী হয়ে উঠেছে। যেমন অনিরুদ্ধ-ঊষা হরণ, ধন্বন্তরী ওঝার মৃত্যু প্রভৃতি। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি অপরিহার্য। বেহুলা-লক্ষীন্দরের মর্তাগমন যেমন কাহিনীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, ধন্বন্তরীর মৃত্যুও চাঁদমনসার দ্বন্দ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসলে সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রসঙ্গগুলি কাহিনীর ঐক্য এবং সংহতি বাড়াত। মধ্যযুগের মঙ্গলকবিদের সচেতন রূপদৃষ্টির অভাবে এরা বিস্তৃতি পেয়েছে। এই বিস্তৃতি রচনার দুর্বলতা, এরা

কিন্তু স্বতন্ত্র কাহিনী নয়। অবশ্য কোনো কোনো কবির হাতে মনসার জন্ম থেকে পরিণতি পর্যন্ত কাহিনী স্বর্গখণ্ডকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কিন্তু মনসা চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ চাঁদমনসার দ্বন্দ্বের পটভূমিতে স্থাপিত হওয়ায় গোটা কাব্যই মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্র-সৃজনের দুর্লভ নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।* চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি কাহিনী নিশ্চিতই পরস্পর সংশ্লিষ্ট নয়। দুইটি মর্তকাহিনীতে আভাসে-ইঙ্গিতে যে চণ্ডীচরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে দেবখণ্ডের চণ্ডীর স্বভাবগত কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেবখণ্ডে শিব-সতী-পার্বতীকে নিয়ে কবি যে গল্পটি গড়ে তুলেছেন তা একটি স্বতন্ত্র কাহিনী রূপেই বিবেচিত হবে।

মনসামঙ্গলে ঝালুমালুর মনসা পূজা একটি গৌণ প্রসঙ্গ। কাহিনীতে এই প্রসঙ্গের গুরুত্ব মনসা পূজার ইতিহাসের প্রতিফলন হিসেবে। ঝালুমালুর মত নিম্নশ্রেণীর কাছে পূজিত দেবী কি ভাবে চাঁদসদাগরের ন্যায় উচ্চ-অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভূর কাছ থেকে পূজো পাবার চেষ্টা করলেন তারই কাহিনী এই কাব্যে কথিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও কালকেতুর মত অন্ত্যজের কাছে সহজে পূজিত দেবী কিরূপে ধনপতির মত বণিকশ্রেষ্ঠের পুজো পেল তার কাহিনী হতে পারত। কিন্তু কালকেতুর প্রসঙ্গটি একটি পূর্ণদেহ কাহিনী হয়ে উঠেছে। শিব-সতী-পার্বতীর দেবপ্রসঙ্গ, কালকেতু কাহিনী এবং ধনপতির উপাখ্যানে একই দেবতার কথা বলা হয়েছে।§ এদিক থেকে এক ধরনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সম্পর্ক ভক্তকে পুলকিত করতে পারে আরাধ্যা দেবীর লীলা-বৈচিত্র্য পাঠে, কিন্তু কাব্যরসিকের কাছে কোনরূপ কাহিনীগত ঐক্যের বোধ নিয়ে আসতে পারে না। এই তিনটিই স্বতন্ত্র কাহিনী, এ বিষয়ে

* বিশেষ করে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য।

§ পুরাতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকেরা কালকেতু-পূজিত চণ্ডী এবং ধনপতির আখ্যায়িকার চণ্ডীর মধ্যে পার্থক্য দেখতে পান। কাব্য বিচারের দিক থেকে সাধারণভাবে এদের এক দেবতা মনে করলে কোনো ক্ষতি নেই।

কোনো সন্দেহ নেই। এই স্বাতন্ত্র্য চণ্ডীমঙ্গলের নিজস্ব কাব্য-ঐতিহ্য। দ্বিজ মাধব অবশ্য স্বর্গখণ্ডে দেবীর মঙ্গলাসুর বধের কথা বলেছেন। সে বিবরণ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু স্বর্গ বিবরণ এবং দুটি মর্তকাহিনী—এদের অন্যোন্য সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধতে পারেন নি তিনিও। মুকুন্দরাম এই ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রতিভার লক্ষণ সেখানেই, তিনটি ভিন্নধর্মী গল্পকে তিনি একটি পাত্রে পরিবেশন করেছেন। কোনো ঐক্যে এরা সংহত হয় নি, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই একটি তোড়ায় এরা মিলেছে। এই তোড়া বাঁধার কৌশল মুকুন্দরামের।

তিনটি কাহিনীরই মূল রস পরিবার-রস। পরিবার রস নামে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কোনো রস নেই। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমালোচনা প্রসঙ্গেও এই বস্তুটি কোথাও বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠে নি। দেশকাল-অতীত কোনো আবেদন নেই এই রসের। আমাদের দেশে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যানে আলঙ্কারিকেরা প্রায়ই মানব চিত্তের এক একটি শাশ্বত প্রবৃত্তির উপরে ভিত্তি করেছেন। পরিবার রস বলতে আমি এমন একটি মিশ্র রস বোঝাতে চাই যার মধ্যে ঐ শাশ্বত প্রবৃত্তির সঙ্গে আরও নানা গৌণপ্রবৃত্তির সম্মিলনজাত আস্বাদ লাভ করা যায়। কিন্তু এই মিলন ঘটায় ঘনপিনদ্ধ পরিবার জীবন। মধ্যযুগে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোথাও তীব্র হয়ে ওঠে নি পরিবার জীবনে। সুখদুঃখের লীলা, ঈর্ষা প্রেম বাৎসল্যের বিচিত্রমুখী প্রবাহের একটি ঘরোয়া ফলশ্রুতি একান্ত সত্য হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকেই মুখ্যত দৃষ্টি পড়লেও পরিবার জীবনের আনন্দবেদনার সুর মহাকাব্যিক আড়ম্বরের মধ্যেও কবিদের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নবীন চন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের কথা মনে পড়তে পারে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও মহামৃত্যুর মাঝখানে পাণ্ডবশিবিরে অভিমন্যু-উত্তরা-সুলোচনা-বিরাট প্রভৃতি মিলে যে লঘু কৌতুক ও ঘরোয়া সুর জমিয়ে তুলেছিল রচনাটির মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য তার দ্বারা বিচলিত হয়েছে এবং সমগ্রতা ব্যাহত

হয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এর মধ্যে যে আস্বাদটি পাওয়া যায় তা পরিবার রসের। হেমচন্দ্র প্রসঙ্গেও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক মন্তব্য করেছিলেন, "বৃত্রসংহার ঠিক মহাকাব্য নহে, মহাকাব্যের গার্হস্থ্য সংস্করণ। এখানে যেমন ঐন্দ্রিলার দম্ভ ও আত্মপ্রাধান্য-বিস্তার ও বৃত্রের ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণতা, সেইরূপই ইন্দুবালার কুসুমপেলব কমনীয়তা, হেমচন্দ্র ইন্দুবালা চরিত্র-কল্পনার সময় গার্হস্থ্যচিত্রেই নিজ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, মহাকাব্যের বৃহত্তর পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।" * বাঙালি মহাকবিদেরও পরিবার-রসের প্রতি কি পরিমাণ লোভ ছিল তা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করবার মত। বিংশ শতকেও এই প্রবণতার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্রের মত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের রচনার একটা বড় অংশ পরিবার-জীবন-নিষ্কাসিত মৃদু তরল ও কোমল আস্বাদের জন্যই উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাসুরী কোনো কোনো কবির রচনায়ও গৃহসংসারের প্রীতি রসরূপে বদ্ধ। কুমুদরঞ্জন অতীতের পরিবারজীবনের ঐতিহ্যকথন ও স্মৃতিচয়নে আনন্দিত। আর কালিদাস রায় গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি পরম আস্থা জানিয়ে বলেছেন,

রাষ্ট্র বল, দেশ বল, সমাজ, সংসদ বল কারো মোরা নই।···
গৃহই মোদের সব, প্রাণপণে করি তার আঁধার হরণ,
নিভে যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর হয় কি পুরণ॥—(গৃহদীপ)

পরিবার জীবনের ছবি থাকলেই পরিবার রসের সৃষ্টি হয় না। গৃহজীবনে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিত্বের আর্তি সমাজকে আলোড়িত করতে পারে, নিখিলের আকাশকে বিদ্ধ করতে পারে। কখনো গার্হস্থ্য কাহিনীতেই সমাজ সমস্যা তরঙ্গিত হতে পারে। পরিবারকে কেন্দ্র করে মান-অভিমান-স্নেহ-প্রীতি-স্বার্থবুদ্ধি-উদারতার মিশ্রণে যে এক ধরনের আস্বাদ্য পদার্থ নির্মিত হতে

* তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা

পারে চিরন্তন সাহিত্য-কর্মের দরবারে এবং দেশকাল নিরপেক্ষ মানবসমাজের কাছে তার আবেদনের কথা চিন্তা না করেও বাঙালি পাঠক তা মেনে নেবে। তারই নাম দেওয়া যাক পরিবার রস।

(মঙ্গলকাব্যে পরিবার জীবনের চিত্র আছে। ধর্মমঙ্গলে বেশি নেই। মনসামঙ্গলে আছে। কিন্তু এ কাব্যের প্রধান আস্বাদ ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত স্ফূর্তিতে, মৃত্যুলোক জয় করার রোমান্টিক অভিসারে, দেবতা ও মানুষের সংঘর্ষে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পরিবারজীবনের ছবিই প্রধান। বিশেষ করে মুকুন্দরামের এই জীবন বস্তুবর্ণনা থেকে রসাস্বাদে রূপান্তরিত, সমুন্নীত। মুকুন্দরামের কালকেতুর যুদ্ধ প্রাণহীন, রাজাগিরি অস্পষ্ট। ধনপতির বাণিজ্য-কথা অবিশ্বাস্য, শ্রীপতিকে বাঁচাতে ডাকিনী-যোগিনীর সমাবেশ বীভৎস রস সৃষ্টির প্রথানুগ চেষ্টা। পুরাণকাহিনীগুলি বিবর্ণ, দক্ষযজ্ঞবর্ণন মামুলি। কামভস্ম-রতিবিলাপ-উমার তপস্যা নীরস অনুকরণ। পরিবার জীবন কথায় মুকুন্দরাম সফল, এবং এর চারপাশে যে হাটবাজার, রুজি রোজগার তার কথাও প্রাণপূর্ণ। লক্ষ্য করবার মত, মুকুন্দরাম তিনটি কাহিনীর প্রাণকেন্দ্রটি স্থাপন করেছেন গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে।)

অনিমন্ত্রিত সতী পিতৃগৃহে উৎসবে যাবার অনুমতি চাইল। নিমন্ত্রণ বিনা কি করে যাওয়া যায়। শিব অনুমতি দিল না। বাঙালি মেয়ে পিতৃগৃহের কথায় সর্বদাই উদ্যতপদ। কলহ হল। ক্রুদ্ধ সতী বিনা অনুমতিতেই দক্ষ-গৃহের দিকে পা বাড়াল। বাধ্য হয়ে শিব সঙ্গী-উপকরণ যুগিয়ে সন্ধি করল। সেই যাত্রাই সতীর শেষ যাত্রা হল। সতীর মৃত্যুতে মাটিতে লুটিয়ে শিবের ক্রন্দনের কথাও কবি বলেছেন। দীর্ঘকাল পরে শিব দ্বিতীয়বার বিবাহ করল পার্বতীকে। শ্বশুরালয়ে তাদের বাস, মেনকার সঙ্গে পার্বতীর কলহ ও পিতৃগৃহত্যাগ। নিদারুণ দারিদ্র্য, শিবের ভিক্ষা, দারিদ্র্যের জন্য শিব-পার্বতীর কলহ পর্যন্ত এই কাহিনীর বিস্তার। দক্ষযজ্ঞধ্বংস এবং শিবতপস্যা-কামভস্মের প্রসঙ্গটি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি, সে অংশ নিশ্চিতভাবে অনুকরণ-

জাত। মৌলিক পরিকল্পনাটুকু থেকে বলা যায় পরিবারজীবন—দারিদ্র্য ও দাম্পত্য কলহ এর মুখ্য আস্বাদ।

(কালকেতুর কাহিনীতেও বিশ্বাসযোগ্য জীবনচিত্রণটুকু পরিবার-কেন্দ্রিক। কালকেতুর জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহের বর্ণনার পরে তার ভোজন ও শিকারের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চণ্ডীর আগমনে এই নিবিড় দাম্পত্যজীবনে যে ভীতি ও আশঙ্কার ছায়াপাত ঘটেছে তাও সতীন-ভীতির। বনের পশুদেরও গার্হস্থ্য জীবন-প্রীতির কথা কবি বলেছেন। কালকেতুর রাজপ্রাসাদের বাহিরের আড়ম্বরে চোখ ঝলসে না গেলে দেখা যাবে, ব্যাধ দম্পতির পরিবার-জীবনের পুরানো নিঃসঙ্গতা ঘোচে নি, দারিদ্র্যমুক্তি এসেছে।

ধনপতির আখ্যানে বিবাহিত ধনপতির নবযুবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় গল্পের যবনিকা উঠেছে। তার দ্বিতীয় বিবাহ এবং দুই সতীনের উচ্চরব কলহ কাহিনীর মুখ্য অংশ জুড়ে বসেছে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় বাহির বিশ্বের উত্তেজিত যে হাওয়া গল্পের পালে লেগেছে তা একান্ত কৃত্রিম। সিংহলে ধনপতির অবস্থানের চেয়েও শ্রীপতিকে কেন্দ্র করে যে বাৎসল্য রসস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

পরিবার-রসের সূত্রে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বেণীবদ্ধ হয়েছে। সম্ভবত এদের মধ্যেও পরিবারজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের একটি বিশেষ প্রত্যয় আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীপতিকে কেন্দ্র করে ধনপতি আখ্যানের শেষ দিকে কিছু বাৎসল্য রস প্রকাশ পেলেও সমগ্রত এত বিস্তারিত গৃহজীবনের বর্ণনায় বাৎসল্য আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবি করতে পারত। কিন্তু কবি সেদিকে তাকান নি। মধ্যযুগের সমাজ-অভিজ্ঞতায় বাঙালি পরিবার-জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কে যে সব বিচিত্র সমস্যা দেখা দিত কবিকঙ্কণচণ্ডী তারই শিল্পোচিত পর্যবেক্ষণ। উচ্চবর্ণের দরিদ্র সংসারে দাম্পত্য কলহের প্রধান কারণ সম্পদহীনতা। শিব কাহিনীতে তার চিত্র এঁকেছেন কবি। বৃদ্ধ স্বামীর তরুণী পত্নী যে বিশেষ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে কবি তার ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছিলেন।

বর দেখি এয়োগণ করে কানাকানি।
চক্ষু খাক পিতা চক্ষে পড়ুক ছানি॥
হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ॥
...   .
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া হর।
দেখিয়া বরের রূপ জ্বলয়ে অন্তর॥

কন্যার মাতা বরণডালা ফেলে দিয়ে ঘরে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে। উচ্চ-কণ্ঠে স্বামীকে গালি দিয়ে বলল—

মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥

কিন্তু দ্রুত শিব মদন-মোহন রূপ ধারণ করায় এ সমস্যার সমাধান হল। কবি ধর্মবিশ্বাসের এবং ভক্তিরসের উপরে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার চেয়ে কিছু বেশি জোর দিয়ে ফেলেছেন এখানে। ফলে দাম্পত্যসমস্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের ছবি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। তাছাড়া দাম্পত্য সম্পর্কে আরও কিছু জটিলতা এখানে ছিল। তা বহুবিবাহজনিত। সতী শিবের প্রথমা পত্নী, পার্বতী দ্বিতীয়া পত্নী। কিন্তু প্রথমার মৃত্যুর বহুকাল পরে দ্বিতীয়াকে বিবাহ করেছে শিব। তাছাড়া পৌরাণিক বিশ্বাসের দিক থেকে সতীরই নবরূপ পার্বতী। কাজেই শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনে অতীতের ছায়াপাত কখনও সমস্যার সৃষ্টি করে নি।

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে দরিদ্র একটি অন্ত্যজ পরিবারের জীবনচিত্র স্থান পেয়েছে। দারিদ্র্যের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি এই কাহিনীতে। দরিদ্র ব্যাধ চণ্ডীর কৃপায় রাজা হয়েছে। ফুল্লরার বারমাস্যায় তাদের অভাবজনিত দুঃখের বিস্তৃত বিবরণ স্থান পেয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য এদের দাম্পত্যজীবনে কোনোরূপ

সঙ্কটের সৃষ্টি করে নি। এদের দাম্পত্য জীবনে সতীনের আশঙ্কাই রীতিমত সমস্যা ঘনিয়ে তুলেছিল। গোধিকামূর্তি পরিহার করে চণ্ডী যখন অপরূপ সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করল, ঘরে ফিরে সুন্দরীকে দেখে যখন ফুল্লরা শুনল কালকেতুই তাকে ঘরে এনেছে, তার মনে সতীনের ভয়টিই প্রবলভাবে দেখা দিল। ফুল্লরার সমগ্র আচরণে এবং বাক্যে এবং চণ্ডীর কৌতুক কটাক্ষে ঐ একটি দিকেই আঙ্গুল তুলে দেখানো হয়েছে।)কবি বলেছেন,

হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস।
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস ॥

সব ব্যাপারটি সম্পর্কে কবি কতটা সচেতন ছিলেন এখানে তার প্রমাণ মিলবে। চণ্ডী আত্মপরিচয় দান করতে গিয়ে বিশেষভাবে বলেছে,

সাত সতিনীরা মারে বুঝিয়া না শাস্তি করে
সাত সতা পরাণের বৈরী ॥
যে ঘরে সতিনী রয় হিংসানলে প্রাণ দ'য়
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।

সতিনী প্রসঙ্গ ফুল্লরার সবচেয়ে ভীতির কেন্দ্রকে আন্দোলিত করল। এদিক দিয়ে তার জবাবও উদ্ধারযোগ্য,

সতিনে কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।
কোপে কৈলে বিষ পান আপনি ত্যজিবা প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ॥

কালকেতু-ফুল্লরার জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু অশান্তি নেই। কারণ গৃহে শাশুড়ী ননদী নেই, বিশেষ করে ফুল্লরার সতীন নেই। কালকেতুর মুখ দিয়ে কবি এই কথাই বলিয়েছেন,

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা ॥

কালকেতু-আখ্যানে সপত্নী-সমস্যাটি প্রকৃত নয়, এই প্রসঙ্গ তুলে হয়তো কবি সপত্নীহীন গৃহকেই দাম্পত্যজীবনের আদর্শ বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সর্ববিধ দুঃখ ও অভাবের মধ্যেও সে জীবনে শান্তি অবিচল।

পক্ষান্তরে ধনপতি সদাগরের আখ্যানটি আসলে সপত্নী-সমস্যার কাহিনী। ধনপতির খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হওয়া থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত। লহনা-খুল্লনা বিবাদে, খুল্লনার দাসীবৃত্তিতে এর চরম প্রকাশ। শেষ পর্যন্তও এই সমস্যা নির্বাপিত হয় নি, তার গুরুত্ব হারিয়েছে। খুল্লনার বাৎসল্যের পশ্চাতেও সপত্নীর বঞ্চিত মাতৃত্বের ঈর্ষাবিষজর্জর মূর্তি উঁকি দিয়েছে। লহনা-খুল্লনা-দুর্বলা-লীলাবতী, স্বয়ং ধনপতি এবং কতকটা শ্রীপতি এই সমস্যাটির বিস্তার ও পুষ্টিতে সহায়তা করেছে। ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্যব্যাপারের নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতার কথা মনে রাখলে, কাহিনীর আসল রস যে সপত্নী-সমস্যায় তা বোঝা যাবে। লক্ষণীয় ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যে শান্তি লহনা-খুল্লনার দাম্পত্যজীবনে আসে নি, ভাগ্যবতী সন্তানবতী হয়েও খুল্লনা যে সপত্নী-বিদ্বেষের ঈর্ষায় দগ্ধ হয়েছে, একান্ত দারিদ্র্য এবং বন্ধ্যাত্বের শূন্যতা সত্ত্বেও সেই কাম্য শান্তি ব্যাধের কুটিরকে মহিমা দিয়েছে।

দরিদ্র উচ্চবর্ণ, দরিদ্র অন্ত্যজ এবং সম্পদশীল অভিজাত পরিবারের তিনটি কাহিনীতে রসবৈচিত্র্য আছে। মধ্যযুগের বাঙালির দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র রূপ পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন কবি। তিনটি কাহিনীর আধারে সর্ববিধ বৈচিত্র্যকে ধরা যায় নি, কিন্তু তার অনেকখানি যে কাব্যভাত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মুকুন্দরামের ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক কবি এই বৈচিত্র্যকে কৌতুকের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সরস করে পরিবেশন করেছেন। কোনোরূপ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করতে চান নি। কিন্তু অনুচ্চ হলেও কবির যে জীবন সমালোচনার সুর এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, আমি একটু আগেই তার ইঙ্গিতটি ধরবার চেষ্টা করেছি।

দুই ॥ কাহিনী বৃত্ত : ধনপতি-আখ্যান ॥

কাহিনীগঠনের নানা পদ্ধতি গল্পসাহিত্যে প্রচলিত। তার মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই দুটি পদ্ধতি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। একটি কেন্দ্রে যেখানে কাহিনীটি সম্বদ্ধ সেখানে গ্রন্থনে নিবিড় ঐক্য প্রত্যাশিত। দ্বিতীয় রীতিতে একটি ব্যক্তির কীর্তিজ্ঞাপক এবং চরিত্র বিকাশের সূত্রে বদ্ধ নানা কাহিনীতে গল্প শাখায়িত। ব্যক্তিত্বের ঐক্যে সেখানে কাহিনীর ঐক্য। পরবর্তীকালে কথা-সাহিত্যে আরও নানাবিধ রূপরীতি দেখা দিয়েছে। গল্প-কথনের নূতন নূতন ভঙ্গি-অনুসন্ধানে লেখকদের চিরনবায়মান উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিচারে একান্ত নবীন পন্থাগুলির প্রসঙ্গ অবান্তর। কাজেই আদিম দুটি রীতির পটভূমিতে ফিরে আসা যাক।

দেখা যাক চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীগঠনকে দ্বিতীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা। যদি চণ্ডীদেবীর মহিমাজ্ঞাপনকে কাব্যের কাণ্ডরূপে ধরে তিনটি কাহিনীকে তিনটি শাখারূপে গ্রহণ করি, বহু শাখা বিস্তারেও যেখানে বৃক্ষত্বের ঐক্য—সেজাতীয় ঐক্যের অনুসন্ধান করি, তাহলে কোনো সার্থক ফলশ্রুতি ঘটবে কি? আগেই দেখেছি সে ধরনের কোনোরূপ সম্বন্ধ এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে নেই। চণ্ডীর কোনো সুসঙ্গত চরিত্র, চারিত্রিক ক্রমবিকাশ কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় নি; মঙ্গলকাব্যের ভক্তিপ্রচার-বাসনা ছাড়া অন্য কোনো সূত্র নেই।

কিন্তু কালকেতু-কাহিনীকে কালকেতুর ব্যক্তিত্বে শাখায়িত বিস্তার বলে গ্রহণ করার কোনো যুক্তি আছে কি? কালকেতুর মধ্যে কাহিনীর বিভিন্ন অংশে আত্মবিস্তারমূলক বহুলতা নেই। এ কাহিনীর এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আছে, যেখানে কালকেতুর উপস্থিতি গৌণ, প্রাসঙ্গিক মাত্র—সক্রিয় নয়। ফুল্লরা-চণ্ডী সংবাদ, ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ও আচরণ, কলিঙ্গে ঝড়বন্যা এবং

নগরের নানা শ্রেণীর নাগরিকের পরিচয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঠিক একইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ধনপতির আখ্যানেও ধনপতির সক্রিয় ব্যক্তিত্ব বহুস্থানেই মৌন। লহনা-খুল্লনা সংবাদে ধনপতি পরোক্ষ কারণমাত্র, ঘটনাংশে ভূমিকাহীন। আবার কাহিনীর শেষভাগে শ্রীপতির আবির্ভাব থেকে কাহিনীর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীপতি, ধনপতি তখন থেকে একেবারেই গৌণ।

কাহিনীগুলিকে গল্পকথনের প্রথম পদ্ধতির আদর্শে বিচার করাই বিধেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে মনসামঙ্গলে কেন্দ্রানুগ বৃত্তাকার গল্পগঠন-রীতিই অনুসৃত। চাঁদ এবং মনসার বিপরীতমুখী আদর্শ এবং ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষই এই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। চাঁদের মনসাপূজায় অস্বীকৃতি থেকে এর উদ্ভব। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁদের মনসাপূজায় এর সমাপ্তি। নানা ঘটনাও দানা বেঁধে এখানে তাই একটিই ঘটনা। সদাগর মনসাকে পূজো করতে রাজী নয়, মনসা তার মূল্যবান সম্পদ 'গুয়াবাড়ি' ধ্বংস করেছে। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী গুয়াবাড়ি বাঁচিয়ে তুলেছে মন্ত্রবলে। মনসা তাই ধন্বন্তরীকে কৌশলে হত্যা করেছে। কিন্তু চাঁদ স্বয়ং মহাজ্ঞানের অধিকারী। মনসা নটীবেশে চাঁদের প্রবৃত্তিতাড়নার সুযোগে মহাজ্ঞান হরণ করেছে। মহাশক্তিধর বন্ধুর সহায়তা এবং নিজের মন্ত্রশক্তি হারিয়ে চাঁদ শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের শক্তিতে সংগ্রাম করতে লাগল মনসার বিরুদ্ধে। মনসা তার ছয় পুত্রকে বিষভাত খাইয়ে হত্যা করল। বাণিজ্যে সংগৃহীত প্রভূত সম্পদ সহ তার চৌদ্দ ডিঙা সমুদ্রে ডুবল মনসার ষড়যন্ত্রে। অনেক দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা সহ্য করে চাঁদ প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে এল। অবশেষে তার অধিক বয়সের সন্তান লক্ষীন্দরের প্রাণ রক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মনসার সর্পাঘাত নেমে এল। কিন্তু তাতেও চাঁদসদাগর অটল রইল। অবশেষে পুত্রবধূর সাধনায় যখন সব হারানো ধন ফিরে এল, চাঁদ মনসাকে পূজো করে সকলের দাবি মেনে নিল। নিজের ব্যক্তিত্বকে নির্জিত করল, পৌরুষকে বিক্ষত

করল। তার মৌন হাহাকারের ট্র্যাজেডি অবশ্য দেবপূজার ধূপধূমে অনেক পরিমাণ আচ্ছন্ন হয়ে গেল কাব্যের সমাপ্তিতে।*

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীগঠনে ভিন্নতর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও লাউসেন-মহামদ পাত্রের সংঘাত এই কাহিনীর ভিত্তি রচনা করেছে, কিন্তু এর অন্তর্গত উপাখ্যানগুলি স্বতন্ত্রভাবেই পূর্ণদেহ হয়ে উঠেছে। লাউসেনের বিচিত্র বীরত্বপূর্ণ ঘটনা, বলা যায় নানাবিধ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিবরণে এই কাব্যটি পূর্ণ। সুরীক্ষার প্রলোভন-জয় বা মহামদের দেওয়া মিথ্যা চুরি-অপবাদ অবশ্য পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয়, ক্ষুদ্র উপকাহিনী রূপেই গ্রাহ্য। কিন্তু কামরূপ বিজয় এবং কলিঙ্গাবিবাহ, লৌহগণ্ডার বধ করে কানাড়া লাভ বা ইছাই ঘোষকে নিহত করে ঢেকুর জয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরূপে গণ্য হতে পারে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী-সজ্জার পেছনে শিল্পবোধ ছিল। কঠিন থেকে কঠিনতর বীরত্বের পরীক্ষা, উত্তেজনা থেকে গভীরতর উত্তেজনার দিকে পাঠককে নিয়ে যায়। ঢেকুর জয়ে তা চরমে ওঠে। কিন্তু এরপরেও লাউসেনের কর্মতৎপরতার অবসান ঘটে নি। হাকন্দ-সাধন করে সে পূর্বের সূর্যকে পশ্চিমে উঠিয়েছে। এই বীরত্ব বাহিরের নয়, অন্তরের। ধর্মমঙ্গলে এই কাহিনীকে সর্বশেষে স্থান দিয়ে সাহিত্যরুচিরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐক্যের সূত্রটিও বেশ শক্তিশালী। ফলে সমগ্র কাহিনীরসের দিক থেকে বিঘ্ন দেখা দেয় নি। তাছাড়া এই খণ্ড কাহিনীগুলির মধ্যে সর্বত্রই সংঘর্ষের ভাবটি বজায় আছে। কৌতূহল তাই প্রায় কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে না।§

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্মমঙ্গলের পদ্ধতি গৃহীত হয় নি, আগেই

* মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে আলোচনা বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেব কৃত কাব্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

§ ধর্মমঙ্গল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে রূপরাম-ঘনরামের কাব্যের সাহায্যে।

দেখেছি। মনসামঙ্গলের রীতি অনুস্থত হয়েছে কিনা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ-জাতীয় কাহিনীতে ঘটনাগত ঐক্যই থাকে লক্ষ্য। প্রাচীনেরা বলেছেন "action one and complete"। ঘটনা একটিই এই বক্তব্যটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। খুল্লনা-ধনপতির যে সাক্ষাতে প্রণয়ের স্থত্রপাত সেটি একটি ঘটনা। কিন্তু সে-ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। কারণ এখানে পরবর্তী ঘটনার প্রান্তটি উন্মুক্ত। এই ঘটনা পাঠককে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। খুল্লনা-ধনপতি-প্রণয়, লহনার সম্মতি আদায়, ধনপতি-খুল্লনা-বিবাহ, ধনপতির বিদেশ-গমন, লহনা-খুল্লনার কলহ, খুল্লনার দুর্ভোগ, ধনপতির প্রত্যাবর্তনে খুল্লনার দুঃখের অবসান ও স্বামীর সঙ্গে সুখ-সম্মিলন। অনেকগুলি ঘটনা দানা বেঁধে একটি পূর্ণ কাহিনী হয়ে উঠেছে। খুল্লনা-ধনপতির সাক্ষাৎ ও প্রণয়ের পূর্বপ্রান্ত বন্ধ, অর্থাৎ এর আগে এ ঘটনার কোন স্থত্র নেই। কিন্তু এ ঘটনার উত্তর প্রান্ত খোলা, নতুন ঘটনার দিকে সেই খোলা দরজা আমন্ত্রণ জানায়, অপর সব ঘটনার দুটি দিকই খোলা। পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে উত্তর প্রান্ত ধরে নতুন ঘটনার দিকে বেরিয়ে যাবার জন্য। শুধু মাত্র শেষ ঘটনাটির (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সুখমিলন ও দুঃখাবসান) পূর্বপ্রান্তই শুধু খোলা, উত্তরপ্রান্ত বন্ধ। এই টুকরো ঘটনাগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকলেও পূর্ণতা নেই। সব টুকরোগুলি মিলে একটি পূর্ণদেহ বড় ঘটনা। একেই বলব ঐক্যবদ্ধ একটি কাহিনী। টুকরো ঘটনাগুলি কি মন্ত্রে এই ঐক্য পেল?

ঘটনার খণ্ডগুলি একটি কাহিনীতে সংবদ্ধ হল, একটি সমস্যার ঐক্যে। একটি সমস্যার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিসমাপ্তি সূচিত করছে ঘটনাগুলি। সমস্যার কেন্দ্রে সংবদ্ধ বলেই এরা বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পড়ে নি। বিবাহিত ধনপতি যখন খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হল, তাকে বিবাহ করতে চাইল, তখন থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব। প্রথমা পত্নীকে নানা উপায়ে খুশি করে সে বিবাহের ব্যবস্থা করল। বিবাহ হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে লহনার মনোগত বাধার

উত্তরণ ঘটলো। প্রকৃত বিরুদ্ধতা ছিল তার ব্যক্তিত্বের গোড়ায়, এবং ধনপতি-কর্তৃক তার নারীত্বের অবমাননা ও অস্বীকৃতিতে। কাজেই ধনপতির অবর্তমানে খুল্লনার উপরে চলল প্রতিশোধ। খুল্লনার দুর্ভাগ্য এবং দুঃখের প্রয়োজনীয় বর্ণনা কবি দিয়েছেন। এখানে সমস্যা উঠেছে চরমে। বিরোধী শক্তির প্রবলতা প্রতিষ্ঠিত। নায়িকার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই যেন দেখা যাচ্ছে না। এই অংশকে বলা চলে কাহিনীর climax। তারপরে ধনপতির প্রত্যাগমনে তার অবসান ঘটল; খুল্লনা পুত্রবতী হবার সম্ভাবনায়, সমস্যা-রূপিণী লহনাকে মনের ঈর্ষা মনে পোষণ করে দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে হল। তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটল। খুল্লনা-ধনপতির দিক থেকে দেখলে বাধা অপসারিত হল। সমস্যার সমাধান হল। কাহিনী পূর্ণতা পেল।

এ কাহিনী পূর্ণাঙ্গ, ঐক্যবদ্ধ। কারণ একটি সমস্যার আরম্ভে এর আরম্ভ, সমস্যার গভীরতায় এর climax, এবং সমাধানে কাহিনীর সমাপ্তি। ধনপতির কাহিনী থেকে আমরা গল্প গঠনরীতির একটি মুখ্য পদ্ধতির উদাহরণ নেবার চেষ্টা করলাম।

এই কাহিনী আরও কিছুটা অনুসরণ করা যাক।

ধনপতি-খুল্লনার সমন্বিত দাম্পত্যজীবনে একটি নূতন সমস্যা দেখা দিল। ধনপতিকে বাণিজ্য করতে সুদূর সিংহলে যেতে হবে। কিন্তু এ একটি নূতনতর সমস্যা। ধনপতির অনুপস্থিতিতে যদি খুল্লনা-লহনার সপত্নীদ্বন্দ্ব আবার তীব্র হয়ে উঠত, তাহলে সমস্যা একই ধরনের হওয়ায় দুটি কাহিনী একটি কাহিনীতে পরিণত হত। অবশ্য পুনরুক্তি দোষে তার গল্পরস যে অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুন্দরাম যে সমস্যার দ্বার রুদ্ধ করে সমাপ্তি টেনেছেন, তার যবনিকা আবার তুলে ধরেন নি। ধনপতির সিংহলগমন একটি নূতনতর সমস্যা নিয়ে এল। ধনপতি খুল্লনার পূজিতা চণ্ডীদেবীর ঘটে পদাঘাত করে বসল।

লক্ষণীয় এর পেছনে লহনার সপত্নী-দ্বেষ কিছুটা ইন্ধন যুগিয়েছিল। কিন্তু

তবুও এ কাহিনীর সমস্যা সপত্নী বিদ্বেষ নয়। লহনার চরিত্র আশ্রয় করে এই বৃত্তি কাহিনীর পরবর্তী অংশে বারবার দেখা দিলেও তা গৌণ প্রশ্ন হয়েই থেকেছে, খুল্লনার গৌরবকে ধূলিসাৎ করতে পারে নি। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে বিপদ ডেকে এনেছে। ধনপতি চণ্ডীকে অপমানিত করে ক্রুদ্ধ করে তুলল। চণ্ডীর কোপে তার নৌকাগুলি সমুদ্র-মোহনায় বিপর্যস্ত হল। একটি মাত্র বাণিজ্যতরী নিয়ে সে সিংহলে পৌঁছল। আবার চণ্ডীর ছলনা কমলে-কামিনীর রূপ ধারণ করে দেখা দিল। এই ছলনার ফল ধনপতির বন্দীত্ব। ধনপতি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে চণ্ডীর দেওয়া শাস্তি চরমে পৌঁছল বলা যেতে পারে। এই কাহিনীর এখানে climax। চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে ধনপতি যে সমস্যার সূত্রপাত করেছিল এখানে তা চরমে উঠল। এক্ষেত্রেও প্রতিটি ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার দিকে কাহিনীকে এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ধনপতির ঘটে পদাঘাত একেবারে নূতন ব্যাপার, আগের কোন ইঙ্গিতই এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের একবারও সচকিত করে তোলে না। এ ঘটনার পূর্বপ্রান্ত তাই রুদ্ধ, উত্তরপ্রান্ত উন্মুক্ত। কাজেই এ একেবারেই নূতন কাহিনী। কিন্তু climax-য়ে এসে এ-কাহিনীকে কিছুক্ষণ স্থগিত রেখেছেন কবি। দেশে ধনপতির পুত্র হয়েছে, তাকে ঘিরে বাৎসল্য রসের উৎসব চলেছে। অবশেষে শ্রীপতি বড় হয়েছে, পাঠশালায় লাঞ্ছিত হয়ে পিতৃসন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ধনপতির কাহিনীও আবার উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, পথের বিপদ-অভিজ্ঞতা, কমলে-কামিনী দর্শন, রাজরোষ সব মিলে ধনপতির অভিজ্ঞতার একেবারে পুনরুক্তি। এই পুনরুক্তি কাব্য সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কাহিনী গঠনের দিক থেকে এর পেছনেও কবির সচেতন পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। যে অভিজ্ঞতার ফলে ধনপতি কারাগারে প্রেরিত হল, দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করতে বাধ্য হল, সেই একই জাতীয় ঘটনার ফল-শ্রুতিতে কিন্তু শ্রীপতি পিতাকে কারামুক্ত করল, রাজকন্যা বিবাহ করে সগৌরবে দেশে ফিরে এল। চণ্ডীর অকৃপা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা মন্থন করে বিষ তুলেছিল,

শ্রীপতির বাণিজ্যযাত্রা চণ্ডীর কৃপায় অমৃত হয়ে উঠল। শ্রীপতির কাহিনী বহু ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত। তাই গঠনরীতির দিক থেকে কিছু প্রশ্ন জাগে।

শ্রীপতির পিতা ধনপতি বহু বৎসর বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে নিখোঁজ। বালক একটু বড় হল, পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে পাঠশালায় অপমানিত হল। পিতার সন্ধানে বাণিজ্যযাত্রা করল। এখান থেকে শ্রীপতিকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সূত্রপাত মনে করলে তার যাত্রাপথের বিবরণ থেকে সিংহল রাজকন্যা বিবাহ, পিতার উদ্ধার, দেশে প্রত্যাবর্তন, উজ্জয়িনীর-রাজকন্যা বিবাহ সব মিলে একটি পূর্ণদেহ কাহিনীগঠন মনে করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর প্রায় সব লক্ষণই এর মধ্যে আছে।

কিন্তু ধনপতির কারাবাস এবং তার উদ্ধারসাধনের মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় একে উপকাহিনীই বলব। শ্রীপতির উপকাহিনী ধনপতির মূল কাহিনীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অবশ্য সুবিস্তৃত উপকাহিনী হিসেবে প্রয়োজনের বাইরেও এর কিছুটা স্বতন্ত্র বিকাশ আছে। কাব্য কাহিনীর ঐক্যের দিক থেকে তা কিছু ক্ষতিকর নয়। নাটকে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন।

ধনপতির আখ্যানকে গঠনরীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে।

প্রথমত, ধনপতির আখ্যানে আসলে দুটি কাহিনী। একই ব্যক্তি ধনপতির জীবনের দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটি পূর্ণ কাহিনীবৃত্ত রচিত হয়েছে। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সমস্যাগত বা ঘটনাগত কোন যোগসূত্র নেই। দুটিই ধনপতির জীবন-ঘটনা এবং দুটির মধ্য দিয়েই চণ্ডী মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে। চণ্ডীর মাহাত্ম্য ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রচারিত হতে পারে। তাতে এদের মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য স্থাপিত হয় না। ধনপতির জীবন-ঘটনারূপে অঙ্কিত হলেও দুটি সমস্যাই তার চরিত্রের মৌলবৃত্তি থেকে উৎসারিত নয়। ধনপতির দুর্বলচিত্তের রূপমোহ প্রথম সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। দ্বিতীয় সমস্যার

ভিত্তিতে আছে তার ধর্মভাবনাসম্পর্কিত দৃঢ় পুরুষোচিত প্রতিজ্ঞা। এই বৃত্তিটি তার চরিত্রের কোথাও ছিল না, কোথাও সত্য হয়ে ওঠে নি।*

দ্বিতীয়ত, ধনপতির দ্বিতীয় কাহিনীটির মূলে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের কাহিনীর অনুসরণ আছে। কিন্তু চাঁদকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গলের মুখ্য কবিরা যে ঘনীভূত গল্পরস উপহার দিয়েছেন তার সামান্য প্রতিধ্বনিও এখানে শ্রুত নয়। ধনপতির চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণের মিল নেই। কাহিনীর কেন্দ্রে যে দ্বন্দ্ব জীবন্ত ও তীব্র থাকলে গল্প দানা বাঁধে, এখানে তার অভাব। চণ্ডী অত্যাচারী, ধনপতি অত্যাচারিত। চণ্ডী সক্রিয়, ধনপতি নিষ্ক্রিয়। দুই পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে কর্মতৎপরতা দেখাবে, ঘটনার উপরে নিজের অসপত্ন অধিকার বিস্তৃত করতে চাইবে ; এমন কি যে পক্ষ তুলনায় দুর্বল সে-ও অধিকতর শক্তিমানের প্রভুত্ব মানতে চাইবে না। এভাবে সংঘর্ষপ্রাণ হলেই কাহিনী আকর্ষণীয় হয়। সে আকর্ষণ ধনপতি-চণ্ডীর কাহিনীটিতে নেই। তবে ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী এদিক থেকে আকর্ষণীয়। লহনা-খুল্লনার সংঘাত আদ্যন্ত এর কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে। ধনপতির চরিত্রের কোথাও চণ্ডী-বিরুদ্ধতার গভীর অঙ্কুর নেই। বাইরে থেকে উড়ে এসে এই বিরোধের বীজ পড়েছে। কিন্তু অনুকূল জমির অভাবে জীবন্ত গাছ জন্মায়নি। কবি যা গড়ে তুলেছেন তাতে প্রাণের সাড়া নেই। মনসামঙ্গল কাহিনীর কেন্দ্রেও আছে এই সমস্যা। এই সমস্যাই সেই কাহিনীর প্রাণ। চণ্ডীমঙ্গলে তার শুধু কৃত্রিম অনুকরণ।

তৃতীয়ত, শ্রীপতির উপকাহিনীটি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। ঠিক যে বিবরণের ঘটনা ও বর্ণনা আমরা ধনপতির প্রসঙ্গে পাই, তার হুবহু অনুসরণ দেখি শ্রীপতির কাহিনীতে। ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রায় পথের যে বর্ণনা কবি করেছেন, একই ভাষায় একই পথের বিবরণ মিলেছে শ্রীপতির সমুদ্র-যাত্রা প্রসঙ্গে। মগরায় দুজনের নৌকাই চণ্ডীর মায়ায় বিপদগ্রস্ত। দুইবারই একই ভাষায়

* ধনপতির চরিত্রবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এবিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ঝড় বৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। পিতা-পুত্র একই ধরনের পথের বিপদ ভোগ করেছে, একই রূপ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। উভয়ে কমলে-কামিনী দেখেছে, একই ধারার বিস্ময় অনুভব করেছে। কবিও যেন পরিশ্রম করে বর্ণনায় কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান নি। সিংহলের ঘাটে পৌঁছে পিতা-পুত্র দুজনই কোটালের সঙ্গে একই ভাষায় কলহ করেছে। দ্রব্য বিনিময়ও হয়েছে একেবারে একই পদ্ধতিতে। উভয় ক্ষেত্রেই অগ্নিশর্মা পুরোহিতের আগমনে বণিকের পথের বিবরণ এসে পড়েছে, কমলে-কামিনীর কথা উঠেছে এবং ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। এর পরে অবশ্য কাহিনীর গতি ভিন্নমুখী হয়েছে। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত একই ভাষায় একই বর্ণনা কাহিনী রসের দিক থেকে যে কি পরিমাণ বিরক্তির সৃষ্টি করে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। মুকুন্দরামের মত শিল্পপ্রাণ ব্যক্তির রচনায় এ জাতীয় আলস্যজাত দুর্বলতা কঠিন সমালোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানটিতে কৃত্রিমতা ও দুর্বলতা এর ফলে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

চতুর্থত, আখ্যান কাব্যে কাহিনীগঠন চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। ঘটনা ও চরিত্র যতটা অন্যোন্য হয়ে ওঠে রচনার মূল্য ততই বেড়ে যায়।* ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানটি ঘটনাসর্বস্ব, চরিত্রসাপেক্ষ নয়। ধনপতির প্রথম কাহিনীতে ঘটনা ও চরিত্র নিপুণভাবে টানাপড়েনে বুনট হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে দৈবী শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘটনার পরে ঘটনা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে এই অংশের পাত্রপাত্রীগুলি দাবা বড়ের ছকের মত ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব কাহিনীতে তাদের যে পরিচয় পেয়েছিলাম বর্তমান কাহিনী আরম্ভ হতে হতেই তার উপরে ছেদ পড়েছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নূতন কাহিনীতে সেই সব চিত্তবৃত্তি ভূমিকাহীন। কিন্তু মানুষগুলির কোনো

* বর্তমান অধ্যায়ে কিছু পরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপন্যাস লক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে কিছু তাত্ত্বিক বিচার উপস্থিত করা গিয়েছে।

নূতন চরিত্র পরিচিতিই সত্য হয়ে ওঠে নি যাতে এই স্বতন্ত্র ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা চলে।

ধনপতির আখ্যানের প্রশংসা কমই হয়েছে। কিন্তু বণিক খণ্ডে দুটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী আছে। দ্বিতীয় কাহিনীটির সর্বাংশে নিন্দাই প্রাপ্য। প্রথম কাহিনীর সুনিপুণ গঠনকৌশলকে সেই তিরস্কার যেন স্পর্শ না করে।

তিন ॥ কাহিনী-চিত্র : কালকেতু-আখ্যান ॥

কালকেতুর উপাখ্যানে কাহিনী গঠনের একটি নূতন রীতির সূচনা আছে। কিন্তু পূর্ণতা নেই। কারণ এই নূতন রীতিতে শিল্পীর আস্থা দৃঢ় নয়। বণিক খণ্ডের দুটি কাহিনীতেই আমরা বৃত্তাকার গল্পগঠনের চেষ্টা দেখেছি। দুটি কাহিনী সমান সফল হয় নি। কিন্তু কাহিনী গ্রন্থনের পদ্ধতি দুটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন। ব্যাধখণ্ডের কাহিনী কিন্তু স্বতন্ত্র ধাঁচের। যদি আগে থেকে বৃত্তাকার দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক গল্পগঠনের আদর্শ ধরে অগ্রসর হই পদে পদে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত করতে হবে। সেই সংস্কার মন থেকে সরিয়ে দিয়ে আরম্ভ করলে একটি ভিন্ন গ্রন্থন রূপের আভাস পাব।*

কালকেতুর জন্ম থেকেই এ-কাহিনীর সূত্রপাত ধরতে হবে। তার আগে যা আছে তা মঙ্গলকাব্যের অঙ্গ কিন্তু অনিবার্য প্রথানুগত্য। কালকেতুর জন্মের পর থেকে রীতি-অনুসারী নানা কথায় কবি মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তার প্রধান কারণ মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্ণ, এবং দ্বিতীয় কারণ

> "কবি যাহা দিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠকের প্রস্তুত হওয়া উচিত; পাঠক যাহা চান তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়।" [বিহারীলাল : আধুনিক সাহিত্য/রবীন্দ্রনাথ] "পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনা সংগত নয়।" [রাজসিংহ : আধুনিক সাহিত্য/রবীন্দ্রনাথ]

মধ্যযুগে অতি তীক্ষ্ণ শিল্পচেতনার অভাব। কিন্তু মূলত মুকুন্দরাম একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি রেখেই এগিয়েছেন। দুই তিন বৎসরের কালকেতুর শিশু-ক্রীড়া প্রসঙ্গে বলেছেন

দুই তিন বৎসর গেলে শিশুগণ মেলে।
ভল্লুক শরভ ধরি কালকেতু খেলে॥

এর পরেও কিশোর কালকেতুর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে তার বিক্রমের কথাই বলেছেন কবি। কালকেতুর বিবাহ-কথার কিছু অকারণ বিস্তার ঘটেছে বিবরণে। মঙ্গলকাব্যে বিবাহের কথায় অনেক কিছু বলা হয়। মুকুন্দরামও বলেছেন। পুঁথি বেড়ে গিয়েছে। তারপরে কালকেতুর মৃগয়া—কোনো একদিন বিশেষ করে নয়, নিত্য নিত্য কালকেতু যেভাবে মৃগয়া করে তারই সাধারণ বিবরণ। কালকেতুর ভোজন ব্যাপারেও তাই, প্রতিদিনের অভ্যাসের বর্ণনা। এই পর্যন্ত এসে একটি ছেদ টানতে হয়, কারণ এর পরে কালকেতু ও পশুদের বিবাদকে কেন্দ্র করে একটা নূতন পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে।

এই পর্যন্ত কালকেতুর কাহিনী যা বলা হল নিঃসন্দেহে তা চিত্রধর্মী। কিশোর কালকেতুর রূপ ও বিক্রম, কালকেতুর মৃগয়া, কালকেতুর ভোজন। চিত্রগুলি অসম্বদ্ধ। একটি অপরটিকে আমন্ত্রণ করে না, একে অন্যের জন্যে অপেক্ষা করে না। প্রত্যেকে পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র। কিন্তু একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ছবি হিসেবে এরা আবার অসম্বদ্ধ নয়।

উল্লিখিত তিনটি ছবির ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু এর কোনোটিতেই আমরা কাহিনী হয়ে উঠবার উপাদান পাই না। কালকেতু রোজই মৃগয়ায় যায়। মৃগয়াকালে তার আচরণ সচরাচর কিরূপ হয়ে ওঠে তার চিত্র, কোনো বিশেষ এক দিনের কথা নয় বলেই কাহিনীর উপকরণ নয়। প্রাত্যহিক জীবনচিত্র কাহিনী নয়। ঘটনাটি বিশিষ্ট হওয়া চাই। ঘটনা সাধারণ ও প্রাত্যহিক না হয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী ঘটনার (ঘটনা শৃঙ্খলের) ফলশ্রুতি কিম্বা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারণ হিসেবে। ব্যক্তির উত্তর জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার

করার ক্ষমতা আছে তার উপরে নির্ভর করেই কোনো ঘটনা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। আবার ব্যক্তির জীবনসাধনার কোনো ফলাফল ধারণ করেও ঘটনা মূল্যবান হয়। কোনো ঘটনা প্রবল ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ, চাঞ্চল্যকর ও চমকপ্রদ কি না বিচারের মানদণ্ড সেটি নয়, আসল মূল্যায়ন কার্যকারণ শৃঙ্খলা তথা ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশে, ভাগ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারাই করা বিধেয়। কালকেতুর প্রাত্যহিক মৃগয়া চিত্র, কাহিনীর অংশ নয়; কিন্তু যে মৃগয়ায় তাকে সিংহ-ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা বিশিষ্ট—এই বিশিষ্টতা কালকেতুর অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটায় নয়, কালকেতুর জীবনের নূতন এক অধ্যায়ের উন্মোচনে।

কালকেতুর নির্বিচার পশুহত্যায় বনভূমিতে ত্রাসের সঞ্চার হল। মুকুন্দরামে এই প্রসঙ্গের কিছু অধিক বর্ণনা ও বিবরণ স্থান পেয়েছে। দ্বিজমাধবে উল্লেখমাত্র আছে। নির্যাতিত পশুদল চণ্ডীর শরণ নিল। চণ্ডী কালকেতুকে রাজা করে দেবার সুযোগ পেল। গোধিকা হয়ে চণ্ডী পথিমধ্যে পড়ে রইল। কালকেতু চণ্ডীর মায়ায় বনে পশু না পেয়ে গোধিকাটি বেঁধে নিয়ে বাড়ি এল। গোধিকা চণ্ডী মূর্তি ধরল। আতঙ্কিত ফুল্লরা তাকে চলে যাবার জন্য অনেক কথা বোঝাল। অবশেষে দেবীর ধন পেয়ে কালকেতুর দারিদ্র্য ঘুচল। সে রাজা হল।

আমরা এই পর্যন্ত কাহিনীকে একটি সুসম্বদ্ধ পূর্ণ-দেহ কাহিনী বলে মনে করতে পারি। আবার এ ভাবেও যুক্তি দেখানো যেতে পারে কালকেতুর রাজা হওয়ায় নূতন সমস্যা দেখা দিল। তারই ফল কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ। সেখানেও দেবীর কৃপায় কালকেতুর জয় সুনিশ্চিত হল। কাজেই সবটা জুড়ে একটাই কাহিনী।

এ জাতীয় সিদ্ধান্ত সহজ। কিন্তু এরূপ বৃত্তাকার গঠনরীতিতে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে সামান্য বিশ্লেষণেই যা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কালকেতুর নির্যাতনে বিপদাপন্ন পশুদের চণ্ডীর শরণ গ্রহণ যদি একটা সমস্যার উদ্ভব বলে গ্রহণ করি, তা হলে কালকেতুর পূর্ব জীবনের চিত্রগুলিকে ভূমিকা বা পরিচিতি

মূলক বর্ণনা হিসেবেই মেনে নিতে হয়। অসুবিধা সেখানে নয়। মূল সমস্যাটি কোথায় তাই-ই বিচার্য। পশুদের ক্রন্দনের সমস্যাটি উপলক্ষমাত্র তা বুঝবার জন্য বেশীদূর এগুতে হয় না। কালকেতুর অত্যাচারে উৎপীড়িত পশুদের রক্ষার ব্যবস্থা করল দেবী। বনভূমি কুয়াসাচ্ছন্ন হল, বীরের শিকার মিলল না, গোধিকারূপ ধরে কালকেতুর হাতে বন্দী হল চণ্ডী। কিন্তু অত্যাচারী শিকারীকে রাজা করে দেওয়া হল। রাজা নিশ্চয়ই ব্যাধবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হবে। এ যুক্তিতে পশুমাতার আচরণ সমর্থন করা চলে না। আসলে কোনো একটা সূত্র ধরে কালকেতুকে রাজ্য দেবে চণ্ডী। তাই এই সব আয়োজন। পশুদের প্রসঙ্গ, গোধিকাবৃত্তি তাই নেহাৎই উপলক্ষমাত্র। কালকেতুকে মহাধনবান করে দেবার জন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণই কাব্যে মেলে না। সে দেবীপুজা করে নি। সে চণ্ডীর কৃপা পূর্বেই পেয়েছে। কারণের আগেই কার্য ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যে সচরাচর এমন ঘটে না। গল্পগ্রন্থনের দিক থেকেও এখানে উপযুক্ত কারণ গড়ে তোলা হয় নি।

কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত কাহিনীর সমস্যা কোথায়? সমস্যার অস্তিত্ব সেখানেই যেখানে দুটি বিরোধী শক্তির উপস্থিতি আছে। ধনপতি-খুল্লনার প্রথম কাহিনীতে সপত্নীত্ব সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্যা নায়কের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাধা এবং বাধা-উত্তরণের পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে কখনও সমস্যার সমাধান ঘটে, লক্ষ্যবস্তু হস্তগত হয়। কখনও বাধা-উত্তরণের মধ্যেই নতুন বাধার বীজ থাকে, একটি বন্ধ দরজা খুলে অপর একটি বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে পড়তে হয়।

কালকেতু রাজা হবে, কারণ চণ্ডীর কৃপা। কিন্তু কালকেতুর আচরণে এমন কিছু নেই যাতে চণ্ডীর অকৃপা জেগে উঠতে পারে। অবশ্য কালকেতুর কোন্ কার্য চণ্ডীর কৃপাবর্ষণের ঝারি উজাড় করে দিল গল্প পাঠকের কাছে তাও অজ্ঞাত। কালকেতুর রাজা হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী পরস্পর সম্পৃক্ত, এ কথা মানতেই হবে। একেবারে প্রারম্ভিক ভোজন ও শিকার বর্ণনার মত

পরস্পর অসম্বদ্ধ চিত্র নয় এরা। কালকেতুর পশুশিকারে বন উজাড় হচ্ছে। ভয়চকিত পশুরা চণ্ডীর আশ্রয় নিয়েছে। চণ্ডী প্রতিকারের উদ্দেশ্যে পশুদের লুকিয়ে রেখে বনভূমি কুয়াসাচ্ছন্ন করেছে এবং নিজে গোধিকার মূর্তি ধরে পথে পড়ে রয়েছে। এর প্রতিটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনাকে আমন্ত্রিত করেছে। কিন্তু কালকেতুর রাজা হওয়া পর্যন্ত কোনও সংঘর্ষ নেই, কোনো কেন্দ্রীয় সমস্যা নেই।

এরপরে কালকেতু রাজা হয়ে বসেছে এবং গুজরাট নগর-বর্ণনায় পাঠকের দৃষ্টি কিছুকালের জন্য অন্যত্র প্রসারিত হয়েছে। ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে কবি পরিচিত করিয়েছেন পাঠকদের। উদ্দেশ্য ভাঁড়ুকে দিয়ে কাহিনীর আবর্ত সৃষ্টি করা। এতক্ষণে ভাঁড়ুর খলতায় কালকেতুর রাজাগিরির পথে প্রকৃত বাধা এসেছে। কলিঙ্গ-নৃপতির সঙ্গে কালকেতুর সংঘর্ষ ঘটেছে। কালকেতু বন্দী হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি ও সিংহাসন ফিরে পেয়েছে।

প্রথমত, ব্যাধ কালকেতুর রাজ্যলাভ কাহিনীর প্রধান প্রতিপাদ্য, কেন্দ্রীয় সমস্যা নয়। কারণ কাহিনীর শেষ দিকে কলিঙ্গরাজের আগমনেই প্রকৃত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার আগে কোনো সমস্যা নেই। ফলে এই উপাখ্যান ঘনপিনদ্ধ কাহিনী হিসেবে একেবারেই আকর্ষণহীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোনো প্রতিবন্ধক নেই বলে যা ঘটবার ঘটেই যাচ্ছে, পাঠকের মনে কোনোরূপ কৌতূহলের সৃষ্টি হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, ঘটনাবর্তনের সঙ্গে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কোনো সংযোগ ঘটে নি। ধনপতির প্রথম কাহিনীতে ধনপতির ইন্দ্রিয়লোলুপতা যেমন ঘটনার সূত্রপাত করেছে, লহনা-দুর্বলা-লীলাবতীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তাকে বিকশিত করে তুলেছে। ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব সেখানে অবিনাবদ্ধ। কালকেতু-কাহিনীতে কালকেতু-ফুল্লরার চরিত্রচিত্র বা মুরারি শীল এবং তার স্ত্রীর ভূমিকা উজ্জ্বল। কিন্তু কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণে বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় এদের কোনো ভূমিকা নেই। এদের কারুর চরিত্র অন্যরূপ হলেও ঘটনার উপরে তার প্রভাব পড়ত

না। কারণ ঘটনার সঙ্গে এদের চরিত্রসম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। একমাত্র কালকেতু-কলিঙ্গ বিবাদে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অপরিহার্যভাবেই সংযুক্ত হয়ে আছে।

তৃতীয়ত, কবি কাহিনীগত এই দুর্বলতা অনুধাবন করেছিলেন। একে দূর করবার জন্য কিছু সংঘর্ষ-প্রাণ ঘটনাংশ উদ্ভাবন করেছেন এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের যুক্ত করেছেন। কিন্তু এই সংযুক্তি যথেষ্ট দৃঢ় হতে পারে নি, কারণ মূলের সঙ্গে এদের কোনো আত্মিক যোগ নেই। এই ঘটনাংশগুলি মুকুন্দরামের স্বাধীন উদ্ভাবন, দ্বিজ মাধবে হয় এদের একেবারে উল্লেখ নেই, না হয় খুবই সংক্ষিপ্তসার দিয়ে কাজ সারা হয়েছে।

প্রথমেই পশুদের প্রসঙ্গ। পশুদের সঙ্গে কালকেতুর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ যেমন আছে, তেমনি পশুদের ক্রন্দনে অত্যাচারী-অত্যাচারিতের দ্বন্দ্বমূলক একটি সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। কালকেতু-পশুদের সংঘাতকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি গড়ে উঠেছে তার আকর্ষণ ও কৌতূহল উদ্দীপনের শক্তি অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পশুদের আচরণে মানবভাব আরোপিত হওয়ায় কাব্যকাহিনী উপকথার রাজ্যে পথ হারিয়েছে কিনা তা ভেবে দেখবার মত।

"চণ্ডী কালকেতুর গৃহে এসে নারীমূর্তি গ্রহণ করেছে। দেখে ফুল্লরা ভীত হয়েছে। তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। চণ্ডীর কাছে সব কৌশলই ব্যর্থ হয়েছে। ফুল্লরা কালকেতুকে ডেকে এনেছে। কালকেতু এই অপরিচিতা সুন্দরীকে নিজ গৃহে অধিষ্ঠিতা দেখে বিপদাপন্ন হয়েছে এবং তাকে বিতাড়িত করবার জন্য শেষ পর্যন্ত অস্ত্র তুলতে বাধ্য হয়েছে। কবি এখানেও একটি বিরোধের ভাব জাগিয়ে রেখেছেন। ফলে কাহিনী অনেকখানি ভাবতরঙ্গে আলোড়িত। অবশ্য এই ছদ্মবিরোধে চাপা কৌতুক-রসই প্রধান আকর্ষণ। তবে নিস্তরঙ্গ কাহিনীর অবাধ প্রবাহে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হওয়ায় মুকুন্দরামের সচেতন বিন্যাস-চেষ্টা লক্ষ্য করবার মত।

মুরারি শীলের প্রসঙ্গটি মুকুন্দরামের নিজস্ব পরিকল্পনাজাত। মুরারি দুষ্ট

প্রকৃতির লোক। সরল কালকেতুর হাতে মাণিক্য অঙ্গুরি দেখে সে হস্তগত করবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কালকেতু কিছুটা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ায় একটি অনুচ্চ সংঘাত দেখা দিয়েছে। মুরারি শীলের আচরণ কালকেতুর রাজা হওয়ার পথে সামান্য বাধার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এ বাধা ক্ষণস্থায়ী। চণ্ডীর আকাশবাণীতেই বিলুপ্ত হয়েছে। তবে স্বল্পবুদ্ধি হলেও কালকেতু নিজেই যে মুরারি শীলের শাঠ্যের জালে ধরা দিত না এমন প্রমাণ আছে।

কালকেতুর কাহিনীতে প্রকৃত বাধা এসেছে কলিঙ্গরাজের গুজরাট আক্রমণে। সংঘর্ষের যথার্থ আবহাওয়া সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ভাঁড়ু-কলিঙ্গরাজ এবং কালকেতুকে জড়িয়ে। কিন্তু রাজা হবার পর থেকে কালকেতু-চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্মগুলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় এ সংঘাতও বর্ণবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

কালকেতু উপাখ্যানকে সুসংহত কেন্দ্রানুগ বৃত্তায়িত কাহিনী বলে গ্রহণ করলে বিচিত্র সব দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে, নিন্দার বোঝাই ভারি হয়। আরও গুরুতর হল, পশুদের গল্প, ফুল্লরার সপত্নীভীতি ও কালকেতুর ধর্মভঙ্গ থেকে চণ্ডীর সঙ্গে বিরোধ, মুরারি শীল প্রসঙ্গ অনুরূপ কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সব অংশে চরিত্র-চিত্রণ, বাস্তবমুখী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং কৌতুকরস প্রকৃত সাহিত্যিক উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে।

আমার মনে হয় কালকেতু-উপাখ্যানটিকে চিত্রধর্মী কাহিনীরূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন মুকুন্দরাম। কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্র, তার কোথাও কিছুটা সংঘাত আছে, কোনোটি আবার একেবারে অনুদ্বেল। দরিদ্র কালকেতু অযাচিত দৈবকৃপায় রাজত্ব পেয়েছে, তার ভাগ্যে এই আশ্চর্য পরিবর্তন কতকগুলি চিত্রপরম্পরায় গ্রথিত হয়েছে। চিত্রগুলি পরস্পর নিঃসম্পর্কিত নয়, কিন্তু সব মিলে ঘনপিনদ্ধ দ্বন্দ্ব-প্রাণ একটি কাহিনীও গড়ে ওঠে নি।

কাহিনী হলেই সমস্যাকেন্দ্রে সংবদ্ধ হয়ে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ তরঙ্গিত হতে হতে পরিণতিতে গিয়ে পৌছবে এইরূপ প্রত্যয় থেকে মুকুন্দরাম অনেকখানি সরে গিয়েছেন বর্তমান উপাখ্যানে। তাঁর শিল্পী-প্রাণের মধ্যে সহজ প্রাত্যহিক জীবন ও অনুত্তেজিত স্বরচর্চার প্রতি যে আকর্ষণ ছিল এই নবীন গল্পগ্রন্থন রীতির পেছনে তাই-ই হয়তো কিছুটা সক্রিয় ছিল। তবে কবি এ সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিলেন না। তা হলে মাঝে মাঝে সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠতেন না।

॥ চার ॥ কাহিনী-আভাস : শিব-চণ্ডী বৃত্তান্ত

দেবখণ্ডে শিব-চণ্ডীকে আশ্রয় করে মুকুন্দরাম একটি কাহিনী গড়ে তুলেছেন। এ কাহিনীর অনেকটাই অবশ্য সঙ্কলন, কিছু মৌলিক উদ্ভাবনও আছে। শিবপুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে এই কাহিনীটিই। মুকুন্দরাম অনেক পুরাণবিচার করে চণ্ডীমঙ্গল লিখেছেন, পুরাণ থেকেই তিনি দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ গ্রহণ করেছেন। দক্ষযজ্ঞের তাণ্ডব নিবৃত্ত হবার পরে শিব তপস্যায় বসেছে এবং শেষ পর্যন্ত তপস্যাভঙ্গে পার্বতী-উমাকে বিবাহ করেছে। এই কাহিনীও পৌরাণিক। কিন্তু এক্ষেত্রে মুকুন্দরাম কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শটি সামনে ধরে রেখেছেন। শিব-বিবাহের পরবর্তী পারিবারিক অংশটি মুকুন্দরামের ভাবনাজাত। অবশ্য এই ভাবনার পেছনে বাংলা দেশের লৌকিক বিশ্বাস খুবই কার্যকর ছিল মনে হয়।* এই কাহিনী সর্বপ্রথম কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই কাব্যধৃত হয়। মুকুন্দরামের আগে শিব-পার্বতীর প্রসঙ্গ পাচ্ছি বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে। দুই কবির স্বর্গখণ্ডের

* গৃহধর্মের আদর্শ ই বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা বড়; সেইজন্যই তাহার পরিকল্পিত দেবতা আদর্শ গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক শিবের মত তিনি প্রমথনাথ হইয়া শ্মশান-বিহারী নহেন, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত —তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত গৃহী। [ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।]

কাহিনীতে আংশিক মিল আছে। বিপ্রদাসের শিব-প্রসঙ্গের সঙ্গে ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত ভাবনা সম্পর্কিত। এই দুজনই শিব-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের ছবি এঁকেছেন। তাতে নিশ্চিত অপৌরাণিকতা বর্তেছে, মাটির স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু শিবের চরিত্রশৈথিল্য উক্ত দুটি গ্রন্থেই প্রাধান্য পেয়েছে। মুকুন্দরামে শিবের সেই কামুকতা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। দরিদ্র ভিখারি শিবের পারিবারিক জীবনচিত্রই এ কাব্যে মুকুন্দরামের বিশিষ্ট প্রবণতার সাক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। শিবের পরিবার-কথা বাঙালির লৌকিক-ভাবনায় ধরা পড়েছিল অনেক আগে থেকেই। গ্রাম্য ছড়ায় ও গল্পে হয়ত এর সংক্ষিপ্ত অমার্জিত রূপের প্রচলনও ছিল। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে,—"অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনি-সভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। ..কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্য-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়।"* লোকসূত্র হইতে কাহিনী-মূল গ্রহণ করলেও ভাষারূপে, বিন্যাসে কবি একে নতুন করে গড়েছেন। এর মৌলিকতা মেনে নিতে হয়।

মৌলিক কাহিনী-অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তীব্র মানবতা। বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দেবতাকে মানুষে পরিণত করেছেন কবি অনায়াসেই।** এ বিষয়ে কবির সংশয়মাত্র ছিল না। অন্যত্র সমুচ্চ তাঁর

* গ্রাম্য সাহিত্য : 'লোক সাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ।

** "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না।" [গ্রাম্য সাহিত্য : 'লোক সাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ]

ব্রাহ্মণ্যসংস্কার এই বিষয়ে মাথা উঁচু করতে পারে নি। কিন্তু একান্ত মানব রস-পুষ্ট এই অংশের সঙ্গে পুরাণানুসারী দক্ষযজ্ঞ এবং কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত শিব-তপস্যাকে কবি মেলালেন কোন্ মন্ত্রে ?

দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে পুরাণানুমোদিত উত্তেজিত ঘটনাবর্ত প্রকাশিত। মুকুন্দরামের কবি-প্রাণের সঙ্গে এই জাতীয় সমুচ্চকণ্ঠ ঘটনা-বিবরণের সহজ সম্পর্ক নেই। যজ্ঞস্থানে দক্ষের শিবনিন্দা, প্রত্যুত্তরে সতীর উদাত্তস্বরে শিব-মহিমা জ্ঞাপন, এবং যোগমগ্ন অবস্থায় প্রাণত্যাগ, শিবসেনা কর্তৃক যজ্ঞধ্বংসের তাণ্ডব—সব কিছুই ঘটনা-গৌরবে, বর্ণনায় অত্যুজ্জ্বল, বর্ণপাতে মহাকাব্যিক সৃষ্টিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। মুকুন্দরামের মত বড় কবি এক্ষেত্রে যে কাজ-সারাগোছের স্বল্পবর্ণ ক্ষীণপ্রাণ সফলতা দেখিয়েছেন তার প্রধান কারণ এই সুরে তাঁর মনোবীণা ঠিক বাজে না। আরও লক্ষণীয়, এর মধ্যেই কবি পরিবার-রসের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। বিনা নিমন্ত্রণেও পিতৃগৃহে যাবার জন্য সতীর ব্যাকুলতায় আগমনী গানের পূর্বাভাস শুনতে পাই।

পর্বত কাননে বসি　　নাহিক পাড়াপড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একতিল কোথা যাই　　জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী ॥

তার মনের একান্ত সাধ "মায়ের রন্ধনে খাব ভাত"। শিব অনুমতি না দেওয়ায় সে ক্রোধান্বিতা হয়ে জোর করে একাই বাপের বাড়ি চলল। বাধ্য হয়ে সন্ত্রস্ত শিব সঙ্গী ও সঙ্গতি যোগাল। আবার সতী হারিয়ে শিবের বালকের মত মাটিতে লুটিয়ে কান্নার বর্ণনা দিয়েছেন কবি। সে-কান্নায় গৃহের সুর বেজেছে, রুদ্রের বিশ্বনৃত্যের তাল নেই।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হল। শিব কিন্তু পত্নীবিহনে অস্থির হয়ে পড়ল।

এই যজ্ঞে সতী দেবী ছাড়িল শরীর।
তাঁহা বিনা সর্বদেব হইল অস্থির ॥

গৃহী শিবের গৃহিণীর ব্যবস্থা হল। সতী নবজন্ম লাভ করল হিমালয়ের কন্যারূপে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর মধ্যে উমা-বিবাহের বীজ ছিল। সতীর অভাবে অস্থির শিবের গৃহিণী প্রয়োজন। সতী উমারূপে নবজন্ম গ্রহণ করল। দুটি অংশের মধ্যে অলৌকিকতার সেতুবন্ধ রচিত হল। সেটিও একধরনের গ্রন্থি। তাই কাহিনীর দুটি অংশ অসংশ্লিষ্ট থাকে নি।

মুকুন্দরামের শিবের তপস্যা ব্যাপারটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, ব্রাহ্মণ গৃহীর সন্ধ্যাহ্নিকেব চেয়ে গম্ভীর মাহাত্ম্যসূচকও নয়। দুটি চরণেই তাই বর্ণনাব শেষ—

এমত সময় শিব তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে॥

তপস্যাভঙ্গকেও কোনরূপ গুরুত্ব দেন নাই কবি—"তপোভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্যস্থান।" এই তো তপস্যা! এরই ফাঁকে কবি কালিদাসের অনুসরণে তপোবনে বসন্তসমাগম, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমা-তপস্যা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছেন কালিদাসের অনুসরণে। এর দ্বারা শিব-পার্বতীর গল্পে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য কবির ছিল। কিন্তু মৌলিক গল্পাংশের সঙ্গে এর কিছু-মাত্র সুরসঙ্গতি ঘটে নি। এই গল্পাংশের মধ্যে কোথাও শিব-উমার প্রণয়-উন্মেষের ইঙ্গিত করা হয় নি। শিব-উমার বিবাহের ও দাম্পত্যজীবনের কাহিনীর সঙ্গে এর কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপিত করতে পারেন নি কবি

শিব-পার্বতীর এই কাহিনী-বিচারে শেষ পর্যন্ত বলা চলে—এক। কালিদাসের অনুসরণে যে-অংশ কাব্যমধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তার কাহিনীগত উপযোগিতা বিধান করা যায় নি। দুই। দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক অংশের বর্ণনায় ব্যর্থ হলেও, শিব-পার্বতীর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গের সংযোগ সাধিত হয়েছে। তিন। দক্ষযজ্ঞের মধ্যে সামান্যত হলেও একটি পরিবাররসের সুর প্রকাশ করতে চেয়েছেন মুকুন্দরাম। মৌলিক অংশে তাই-ই একান্ত এবং সমুচ্চ হয়ে উঠেছে। চার। কিন্তু

এই সংযোগসূত্র সত্ত্বেও সমগ্রত দক্ষযজ্ঞ এবং শিবপার্বতীর দাম্পত্যজীবনকে এক কাহিনীতে বাঁধা যায় না। এদের রূপ ও রস একবারে আলাদা। পুনর্জন্মের অলৌকিকতাকে মেনে নিলেও দুই অংশের মধ্যের এই যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। পূর্ব কাহিনীর প্রভাব উত্তরাংশে পড়ে নি, তার স্মৃতিও বিলুপ্ত। এই ভিন্নতাকে মেলাতে পারেন নি কবি, মেলানো সম্ভব হয় নি।

মৌলিক অংশটুকুর বিশ্লেষণেও চিত্রের প্রাধান্য দেখা যাবে, ঐক্যবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-রূপে তারা ঘনীভূত হতে পাবে নি! অবশ্য কাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা কবি করেছেন। শিব-পার্বতীব বিবাহ হল। শিবের দারিদ্র্য ও বার্ধক্যের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এই অংশে। বার্ধক্যের প্রসঙ্গ কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি এই কাহিনীতে। কিন্তু গোড়া থেকেই দারিদ্র্য কেন্দ্রীয় সমস্যারূপে এই গল্পে স্থান পেয়েছে। শিবের দারিদ্র্য এবং কর্মবিমুখতাই এই গল্পে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করেছে। প্রথমেই শিবের শ্বশুরালয়ে বাস, মাতা-কন্যার কলহের দৃশ্য। এব অন্তরালে শিবের ব্যক্তি-চরিত্রই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মায়ের সঙ্গে কলহ করে পার্বতী পতিগৃহে চলে গেল। অভাবের সংসার। বাধ্য হয়ে শিবের ভিক্ষায় বেরুতে হল। শিবেব ভিক্ষা, ভিক্ষান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন। ভিক্ষার ধনে পত্নী-পুত্রসহ শিবেব আনন্দ পরিবার-রসের সুন্দর আলেখ্য। যেমন জীবন্ত তেমনি বাস্তব। কৌতুক-রসের মিশ্রণে উপভোগ্যও। পরের দিন প্রভাতে অলসস্বভাব ভোজনলোলুপ গৃহকর্তাটি আর ভিক্ষায় যেতে চাইল না। আগের দিনের ভিক্ষাজাত দ্রব্যে চর্বচোষ্যের এক বিপুল আয়োজনের দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল। নিরুপায় গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কলহ তাই অনিবার্য। বিবৃত প্রসঙ্গগুলি স্বতন্ত্র চিত্র হিসেবে আস্বাদ্য, আবার পরস্পর সংলগ্নও। প্রতি ঘটনাচিত্র পরেরটির অনিবার্য কারণ। ফলে শিব-বিবাহ থেকে শিব-পার্বতী কলহ পর্যন্ত কার্যকারণের একটি সুসম্বদ্ধ মালা। কেন্দ্রীয় সমস্যাটিও আদ্যন্ত স্পষ্ট। শিবের দারিদ্র্য। কিন্তু এই সমস্যা কোন কেন্দ্রীয় সংঘাতের সৃষ্টি করে নি। তবুও মাতা-কন্যার এবং স্বামী-স্ত্রীর কলহে

দ্বন্দ্বরস বজায় থেকেছে, কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। তবুও এটি কোনো পূর্ণদেহ ঘটনা হয়ে ওঠে নি,। কারণ এ গল্পের শেষ নেই। এর উত্তর প্রান্ত একেবারেই খোলা। সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাতে পার্বতী মর্তে পূজা প্রচার করতে চাইলেন এই সূত্র ধরে কাহিনী দেবখণ্ড থেকে নরলীলায় নেমে এসেছে বটে। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ও প্যাটার্ন পুরোই রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু শিব-পার্বতীর কাহিনী মধ্যপথে অকস্মাৎ খণ্ডিত হয়েছে। এই খণ্ড কাহিনীতে ঘটনা ও চরিত্রের সাযুজ্য ঘটেছিল, তবুও এই একটিমাত্র ত্রুটিতে পূর্ণ গল্পের মর্যাদা একে কিছুতেই দেওয়া চলে না।

॥ পাঁচ ॥ পৌরাণিক প্রসঙ্গ

দেবখণ্ডের মধ্যে পৌরাণিক বিষয় কাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ। মানব-কাহিনীতেও পৌরাণিক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। তার পরিমাণ একেবারেই সামান্য নয়। এখানে ঐ প্রসঙ্গগুলির একটি মোটামুটি তালিকা সঙ্কলিত হল*।

কালকেতু আখ্যান।

এক। দেবীর কঞ্চুলী চিত্রণ। প্রধানত দশাবতার বর্ণন এবং কৃষ্ণের ব্রজলীলার বীরত্ব। দুই। চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ। সীতার বনবাস, পরশুরামের মাতৃহত্যা। তিন। পুনর্বার ফুল্লরার উপদেশ। সাবিত্রী উপাখ্যান। চার। চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ। সীতার লোকাপবাদ। পাঁচ। কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ। বালীসুগ্রীব যুদ্ধ।

* এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ না হতে পারে। কারণ বিভিন্ন পুঁথিতে পাঠভেদে কিছু নূতন প্রসঙ্গ পাওয়া গিয়েছে।

ধনপতি-খুল্লনা-লহনা আখ্যান।

এক। শারীশুকের উপদেশ। শিবিরাজার উপাখ্যান। দুই। রাজার সহিত শুকের কথোপকথন। প্রধানত শ্রীবৎস কাহিনী। তিন। হরিবংশ-কথা। চার। ধনপতির প্রতি রামায়ণের দৃষ্টান্ত।

ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্য-কথা।

এক। শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া, বৎসহরণ ক্রীড়া, প্রলম্ব-বধ ক্রীড়া। দুই। গঙ্গার উৎপত্তি-কথন। তিন। সগরবংশের উপাখ্যান, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা, গঙ্গা আনয়ন, সগরবংশ উদ্ধার। চার। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান। পাঁচ। সেতুবন্ধ উপাখ্যান, সেতুভঙ্গ বিবরণ।

তিনটি কাহিনীতে মোট চৌদ্দটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে। গল্পগুলি এসেছে দুটি সূত্র ধরে। কতকগুলি ক্ষেত্রে উপদেশ বা বক্তব্যের উদাহরণ হিসেবে গল্প বলা হয়েছে; অপর কতকগুলি ক্ষেত্রে ভ্রমণবৃত্তান্তের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য স্থানমাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাণ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

মুকুন্দরাম এই আখ্যানগুলি সংযোজন করে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন তা ভাববার মত। সম্ভবত জনসাধারণকে চণ্ডীর কাহিনী শোনাতে গিয়ে পৌরাণিক শিক্ষামূলক আরও কিছু আখ্যান শুনিয়ে পুণ্য-লাভের সহায়তা করবার ইচ্ছা মুকুন্দরামের ছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেজন্যও এই জাতীয় উপাখ্যানের প্রতি কবি বিশেষ আকর্ষণ দেখিয়েছেন। এইগুলি ধর্মীয় কারণ। কিছু কাব্যিক কারণও ছিল। মুকুন্দরাম পৌরাণিক কাহিনীর স্বতন্ত্র রসের সহায়তায় তাঁর ঘটনাবিরল গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সাহিত্য হিসেবে আমাদের বিচার্য এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে কবি কতটা সফল হয়েছেন।

কালকেতুর উপাখ্যানে কাঁচুলি নির্মাণের ব্যাপারটিই মঙ্গলকাব্যের একটা মামুলি প্রথানুগত্য। এর সঙ্গে কাহিনী বা পাত্রপাত্রীদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কাঁচুলি অলঙ্করণে বহু মঙ্গল-কবিই পুরাণ-কাহিনীর চিত্রায়নের কথা বলেছেন। এখানে মুকুন্দরামের বিশিষ্টতা কিছু নেই। ব্যাধখণ্ডের অপর চারটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপদেশের উদাহরণ। চারটিই ফুল্লরা-কালকেতুর মুখে বসানো হয়েছে। পৌরাণিক সংস্কারের অতিরেক কবিকে প্রকৃত রসবোধ থেকে চ্যুত করেছে। কালকেতু-ফুল্লরার মত অনার্য-সংস্কারের মানুষের মুখে কথায় কথায় এরূপ পুরাণ-প্রসঙ্গ স্বাভাবিক নয়, কবির ব্যক্তিভাবনার আরোপ রূপেই গ্রাহ্য। লক্ষণীয়, এর মধ্যে ফুল্লরার পৌরাণিক উদাহরণ দেবার ঝোঁকটাই বেশি। বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অসঙ্গত হলেও উপদেশের উদাহরণ হিসেবে কাহিনীগুলি সুনির্বাচিত। নারীর সামাজিক অবস্থানের ন্যূনতা, সতীত্বের মূল্য, লোকাপবাদের বিভীষিকা প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে। উদ্দেশ্য অজ্ঞাত-পরিচয় সুন্দরী রমণীকে (অর্থাৎ চণ্ডী) বুঝিয়ে নিজগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে উদাহরণগুলি সুপ্রযুক্ত। বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধের গল্প বলে ফুল্লরা কালকেতুকে সংগ্রামনিবৃত্ত হতে বলেছে। এক্ষেত্রে ফুল্লরার সিদ্ধান্তটি জোর করে করা, উদাহরণে এর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ধনপতি-খুল্লনা-লহনার আখ্যানে শারীশুকের কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ নেই। তাদের মুখ দিয়ে শিবিরাজা ও শ্রীবৎসের যে উপাখ্যান দুটি শোনানো হয়েছে মূল উপাখ্যানের দিক থেকে তার কোনো তাৎপর্য নেই। খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা প্রসঙ্গে সমাগত বণিকেরা হরিবংশ এবং রামায়ণ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছে। বিষয় হিসেবে এরা তাৎপর্যপূর্ণ ও সুসঙ্গত।

ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্য-কথায় শ্রীপতির বাল্যলীলার বর্ণনায় কৃষ্ণের কাহিনী আসে নি ; শ্রীপতি স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। ভাগবতে কথিত কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ও অসুর সংহারের কথাই এখানেও বলা হয়েছে, তবে নায়ক কৃষ্ণ নয় শ্রীপতি। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের

জননী আপন সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছে।* এই সব কাহিনী কল্পনায় যে ভাবনা ক্রিয়াশীল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া যায়, "যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"**

এই আখ্যানের অপর পুরাণ-বৃত্তান্তগুলি শ্রীপতির ভ্রমণ উপলক্ষে কাব্যমধ্যে স্থান পেয়েছে। গঙ্গা নদী ধরে শ্রীপতির যাত্রা শুরু হলে প্রথমে বিষ্ণুপদে গঙ্গার জন্মকথা শোনানো হয়েছে। গঙ্গার মোহনায় সগরবংশ ধ্বংস এবং গঙ্গার মর্ত্যাবতরণে তাদের মুক্তির কাহিনী স্থান পেয়েছে। পুরীতে সদাগর পৌঁছুলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। তবে গল্পের চেয়ে স্থানমাহাত্মই এই প্রসঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে। রামেশ্বর সেতুবন্ধ দিয়ে

* রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে "ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয় এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না।" [ছেলে-ভুলানো ছড়া : 'লোক সাহিত্য']।

** মনুষ্য : 'পঞ্চভূত'।

যাত্রাকালে রাম কর্তৃক সেতুবন্ধন এবং অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন কালে সেতুভঙ্গের কাহিনী—এক কথায় গোটা রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণ-পথের সঙ্গে যুক্ত এই পুরাণ কাহিনীগুলির বিবরণ শ্রীপতির সমুদ্র-ভ্রমণকে ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। ধনপতি ঠিক একই পথ দিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সিংহলে পৌছেছে। দুটি ক্ষেত্রে কবির বর্ণনায়ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। এই পুরাণ-বিবরণ শ্রীপতির ভ্রমণকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

পুরাণ কাহিনীগুলির সংযোজনে ও বিন্যাসে সর্বত্র না হলেও কোথাও কোথাও কবি গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর নিজস্ব রস—দ্রুততাল জীবনের প্রবলতা, শক্তির আতিশয্য, প্রবৃত্তির প্রগল্‌ভতা, বর্ণের বহুলতা, সঙ্গীতের উচ্চকণ্ঠ তীব্রতা—সব মিলে একটা মহান গাম্ভীর্য—মুকুন্দরামের রচনায় প্রকাশ পায় নি। গল্পগুলি বিবরণ-সর্বস্ব এবং কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে ; এক্ষেত্রে কৌশল আছে ঠিকই, কিন্তু শিল্পসিদ্ধি নেই।

॥ ছয় ॥ অলৌকিকতা

পুরাতন গল্পগ্রন্থনে অলৌকিক ছিল বহু আমন্ত্রিত উপাদান। কারণ সেকালে ভক্তি আর ধর্মভাব ছিল সার্বজনীন। সাধারণের ভক্তি আর ধর্মভাব দার্শনিক বোধের স্তরে স্থিত ছিল না। লৌকিক স্থূল বিশ্বাসকেই আশ্রয় করত। এই বিশ্বাস মতে অসম্ভব সম্ভব না হলে দেবমাহাত্ম্য কোথায়? সর্বপ্রিয় কাহিনীকাব্যে এই উপাদানটিকে প্রায়ই বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কখনো একান্ত করে তোলা হয়েছে। দেবতার কৃপায় অসাধ্য সাধন হতে

পারে। সাধনার বলেও অবিশ্বাস্য ক্ষমতা লাভ করা যায়।* এ ছাড়া ভৌতিক প্রসঙ্গও এ রসই পুষ্ট করে তুলত।

আধুনিক কালেও সাহিত্যে অলৌকিকের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায় নি। তবে প্রয়োগপদ্ধতি আর বিশ্বাসের মূল বদলে গিয়েছে। একালে অলৌকিক উপাদান সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করে ব্যঞ্জনার রহস্যমরীচিকা সৃষ্টি করেছে।** অথবা কৌতুক হাস্যের।† গম্ভীর রসের রোমান্টিক গল্প মানবমনের পাপবোধ, বিবেক-দংশন কিংবা চরিত্র-দৌর্বল্যের সূত্রে অলৌকিকের আস্বাদ দেয়। ভৌতিক কিছু থাকলে স্থূল বস্তুরূপে নেই, আছে ভীরুর কল্পনায় এবং অবচেতনায়। অর্থাৎ ভয় থাকতে পারে—মানুষের মনে, ভয়ের কিছু নেই। এটাই আধুনিক সিদ্ধান্ত। এযুগের serious সাহিত্যে দেবতার এবং ভূতের স্থান নেই। ভক্তি বা সাধনার জোরে মানুষের অবিশ্বাস্য কার্যকলাপে বিশ্বাসের অবকাশ নেই।

মধ্যযুগের কাহিনী-কাব্যগুলিতে অল্পাধিক অলৌকিক উপাদান প্রায় সর্বত্র

* "The eight supernatural faculties viz, Anima (the power of becoming as small as an atom), Mahima (the power of becoming big), Laghima the power of assuming excessive lightness at will), Garima (the power of becoming as heavy as one likes), Prapti (the power of obtaining everything at will), Prakamya (the power of obtaining all objects of pleasure at will), Isitva (the power of obtaining supremacy over everything) and Vasitva (the power of subduing, fascinating or bewitching) are well known in the school of yoga." [Dr. Sashibhusan Das Gupta: Obscure Religious Cults etc.]

** রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত রসের গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'নিশীথে'র কথা স্মরণ করা যায়।

† উদাহরণ পরশুরাম প্রভৃতির হাসির গল্প।

আছে। তবে তা গল্পবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ বা মানব-রসের চ্যুতি ঘটায় নি; একটা পরিমণ্ডল মাত্র রচনা করেছে। মনসামঙ্গলে বেহুলার জীবজগত থেকে স্বর্গপুরী যাবার কাহিনী আছে। কিন্তু রূপে-রসে-ভাবে এই দুই লোকের এপাড়া-ওপাড়া ব্যবধান। অবশ্য মৃত লক্ষীন্দরের জীবনলাভের ব্যাপারটি অলৌকিক সন্দেহ নেই। আর এই পুনর্জীবনপ্রাপ্তির অতিপ্রাকৃত দিয়ে চাঁদের পার্থিব দৃঢ়তাকে ভাঙতে হয়েছে কবিদের। অন্য কোনো উপায় তাঁরা পান নি। ধর্মমঙ্গলে লোহার গণ্ডার বলি দেওয়া, শালে ভর দিয়ে পুত্রবরলাভ প্রভৃতি দু'চারটি অনুল্লেখ্য ছোটখাট অলৌকিক ব্যাপার আছে। কিন্তু সাধনাবলে সূর্যকে পশ্চিমে ওঠানো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু ধর্ম কাহিনীর কবিরা এই অসম্ভব ঘটনার একটিমাত্র সাক্ষ্য রেখে বাস্তব পরিবেশ বিনষ্ট হতে দেন নি।

নাথপন্থীদের কাহিনী দুটিতে কিন্তু অতিপ্রাকৃতের অতিরিক্ত সমাবেশ ঘটেছে। মানব-রসের সঙ্গে এর সহজ ভারসাম্য গড়ে তোলা যায় নি। গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী গোদাযমকে যেভাবে তাড়না করেছে তাতে কৌতূহল বিস্ময় এবং অপরিচয়ের জগত জড়িয়ে গিয়েছে। হাড়িপা যেভাবে তার অষ্টসিদ্ধি প্রয়োগ করেছে, তাতে ভোজবাজীর আমোদ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু কাব্যিক আনন্দ কিছু স্বতন্ত্র বস্তু। গভীরতর লোকে তার স্থিতি। অতিলৌকিক সেখানে ভার হয়ে উঠেছে রস হয়ে দাঁড়ায় নি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে অলৌকিক উপাদান বেশি নেই। যা আছে চণ্ডীর দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপনের সূত্রে ধরে এসেছে। মুকুন্দরাম এই উপাদান ব্যবহার করেছেন প্রথানুবর্তনের মনোভাব নিয়ে। অলৌকিক রসের সহযোগে কোনো অভিনব আস্বাদ সৃষ্টি করতে চান নি তিনি। এবং কোথাও কোথাও মধ্যযুগে যতটা সম্ভব বাস্তব ও যুক্তিবোধ্য ব্যাখ্যানের মাধ্যমে অতি-প্রাকৃতকে প্রাকৃতলোকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন।

কাব্যের দেবখণ্ডে পুরাণানুসরণে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে কিছু কিছু অতি-প্রাকৃত উপাদান স্থান পেয়েছে। তা অনুকরণজাত। শিব-দুর্গার দাম্পত্য জীবনের যে মৌল চিত্র এঁকেছেন কবি তাতে অমর্ত্য রসের স্পর্শমাত্র নেই।

কালকেতুর কাহিনীতে অলৌকিক উপাদানকে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবরূপ দিয়েছেন কবি। প্রথা থেকে প্রাপ্ত কাহিনীতে ব্যাধকে রাতারাতি রাজা করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে ছিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য সেখানে নগর বসেছে নূতন। রাজ্যপাটের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সবই দেবীর কৃপা। কবি দেবীর কৃপাটুকু রেখেছেন, কিন্তু পার্থিব কার্যকারণের যুক্তিবিদ্ধ সূত্রে অলৌকিকের বিষটুকু হরণ করেছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীর অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। তিনি গোধার রূপ ধরতে পারেন, গোধা থেকে মুহূর্তে ষোড়শীতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যাধ-দম্পতিকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তাদের সংশয়হীন করবার জন্য মহিষ-মর্দিনীর বেশ ধরতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যাধের হাত থেকে বনের পশুদের রক্ষা করবার জন্য প্রাকৃত কুয়াসার দৃষ্টিরোধি শক্তিই একমাত্র ভরসা।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যাধকে রাজা করার অসাধ্য সাধন করলেন। কিন্তু রূপকথায় ভিখারি যেমন ঘুম ভেঙে নিজেকে সোনার সিংহাসনে দেখতে পায়, কালকেতুর ভাগ্যে ব্যাপারটি অত সহজসাধ্য হল না। মূল্যবান গুপ্তধনের সন্ধান এবং অতি মূল্যবান আঙ্‌টি দান করেই দেবীকে নিবৃত্ত হতে হল। এ জাতীয় ধনসম্পত্তি লাভ দুর্লভ হলেও অলৌকিক নয়।

কালকেতুকে মাণিক্য অঙ্গুরীয় ভাঙাতে হয়েছে শঠেদের সঙ্গে দরদস্তুর করে। দৈববানী তাকে সামান্যই সাহায্য করেছে। তার নিজের চেষ্টায় যা প্রায় সম্ভব হয়ে আসছিল, দৈবোক্তি তাকে কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে কালকেতুকে একান্ত লৌকিক গোলাহাটে নগরপত্তনের উপকরণ কিনতে হয়েছে। বন কেটে বসাতে হয়েছে জনপদ। বাঘসাপ মেরে, কঠিন পরিশ্রমে রাজ্য স্থাপিত হয়েছে।

নূতন রাজ্যে লোক নেই। দেবীর অলৌকিক সাহায্য ব্যর্থ হল।

'স্বপনে কহেন মাতা কেহ নাহি শুনে।'

লৌকিক কারণে কিন্তু জনহীন গুজরাট লোকজনে ভরে উঠল। ঝড়ে বন্যায় সব ভেসে গেল, জোতজমি ক্ষেতের ফসল হেজে গেল। কলিঙ্গের লোক গুজরাটে উঠে গেল। কবি ঝড়বন্যা ঘটিয়ে তুলবার জন্য চণ্ডীর তৎপরতার কথা বলেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটি যে একেবারেই পার্থিব তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

(ধনপতির উপাখ্যানে কমলেকামিনীর প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। কোনো সমালোচক একে 'Ocean mirage' বলে একটি বস্তুধর্মী ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। অন্তত মুকুন্দরামের কাছে ব্যাপারটি একটি অতিপ্রাকৃত বিভ্রমই ছিল। গোটা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যদি অতিলৌকিক রস কোথাও দানা বেঁধে থাকে তবে এই প্রসঙ্গটিকে অবলম্বন করে। এর চারপাশে একটা নিগূঢ় বিস্ময়রস বিকীর্ণ হয়েছে। তবে পুনরুক্তিতে সে রহস্যরস বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে নি।

ডাকিনী-যোগিনীসহ চণ্ডীর মশানযুদ্ধ বিষয় হিসেবে অতিপ্রাকৃত—কিন্তু বীভৎস রসের গ্লানিতেই এর পর্যাবসান।

মুকুন্দরাম অতিলৌকিকের কবি নন। মধ্যযুগের সর্বমান্য প্রথা থেকে যেটুকু এসেছে তার অনেকটাই পার্থিব সত্যবোধের পেছনে চাপা পড়েছে। পার্থিব বাস্তব চেতনায়ই কবিকঙ্কণের শিল্পীচিত্তের মুক্তি—কোনো অপার্থিব রসরহস্যের সন্ধানে নয়।)

॥ সাত ॥ উপন্যাসের লক্ষণ

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জন্মপূর্ব ইতিহাস

অনুসরণ করে বলেছেন "বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মসাহিত্য, ইহার চণ্ডী ও মনসার কাব্যে, বাস্তব চিত্রগুলি আরও স্ফুট ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেবকীর্তি বর্ণনা-উজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা-সন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যতকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়েব প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।"*

মুকুন্দরামের কাব্যে উপন্যাসিক লক্ষণ প্রথমত, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে; দ্বিতীয়ত, দক্ষ-চরিত্রাঙ্কনে; তৃতীয়ত, কুশল ঘটনা-সন্নিবেশে; চতুর্থত, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে। প্রথম দুটি অন্য প্রসঙ্গে আলোচ্য। ঘটনাসন্নিবেশে কুশলতা তথা বিশেষ প্রবণতার কথা বর্তমান অধ্যায়েই অন্যত্র বলেছি।

কিন্তু আখ্যান ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই অন্য সব জাতের কাহিনী থেকে উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য; বলা চলে এখানেই উপন্যাসের প্রথম নিশ্চিত লক্ষণ। ঘটনার উপরে ঘটনা চাপিয়ে কাহিনী

* 'বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা'

গড়ে তোলার পদ্ধতিটি পুরাতন। গল্পসাহিত্যের প্রথম যুগে ঘটনাগত পারম্পর্যই ছিল চরম লক্ষ্য, উপাখ্যানের ভিত্তিতে যে সমস্যা পরিণতিতে তার সমাধান—কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তৃপ্ত করতে তাই-ই ছিল পর্যাপ্ত। মানুষের ভূমিকা ছিল—তবে ঘটনার ছকে দাবার ঘুটির চেয়ে বেশি কিছু নয়। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হত। ব্যথা থাকত। আনন্দও। কিন্তু একটা পুরো ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যের সেই তীক্ষ্ণতা ছিল না যাতে তাকে বলা যায় অনন্য।

উপন্যাসের জন্ম হল সেদিনই অনন্য লোকদের কথা যখন কাহিনীর লক্ষ্য-মুখ হল। শুধু গল্প বলা নয়—ঘটনার পরে ঘটনার ইঁট সাজানো নয়। অনন্য মানুষকে প্রকাশ করা। আখ্যানে আর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে জড়িয়ে মিশে একাকার হয়ে গড়ে উঠল উপন্যাসের কাহিনী। পাত্র নিরপেক্ষ ঘটনার মালা নয়, একটি পাত্র বা পাত্রীর পরিবর্তনে ঘটনার ধারাও আর পূর্ব পথগামী থাকবে না।

কাব্যকাহিনী লিখতে গিয়েও চরিত্রে আর আখ্যানে নিগূঢ় সম্পর্কের এই রহস্যটি মধ্যযুগেই আবিষ্কার করেছিলেন মুকুন্দরাম।

বিশেষ করে ধনপতি-উপাখ্যানের প্রথম কাহিনীতে এই যোগাযোগ হয়ে উঠেছে নিবিড়। ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, এমন কি ঝি দুর্বলা—যে কারও চরিত্র অন্যরূপ ঘটলে কাহিনীর রূপ আর আস্বাদ ঠিক পাল্‌টে যেত। ধনপতির যে ইন্দ্রিয়ালু চরিত্র-শৈথিল্য নবনারী খুল্লনার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করেছিল, উজ্জয়িনীতে গিয়ে গৃহ ভুলে থাকায়ও তাই-ই তাকে প্ররোচিত করেছে। রাজার আদেশে উজ্জয়িনী যেতে হয়েছে ধনপতিকে। এ ঘটনা বহিরাগত—চরিত্রজাত নয়। কিন্তু কবি স্বল্প ইঙ্গিতে দীর্ঘকাল পত্নী আর সংসার ভুলে দ্যূত আর কামক্রীড়ায় তার মগ্ন হয়ে থাকার উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া লহনার নারীত্বের অপমান, ঈর্ষার জ্বালা, অপগত যৌবনের যন্ত্রণা পরিবার-জীবনকে সতীন-কলহে দুঃসহ করে তুলেছিল। কিন্তু লহনার চরিত্রে যা ছিল তাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে সদাগরের দীর্ঘস্থায়ী অনুপস্থিতি,

দুর্বলার পরামর্শ। খুল্লনার মনোভঙ্গিরও যে এ বিষয়ে দায়িত্ব নেই তা বলা চলে না। ধনপতির খুল্লনা-দর্শন থেকে, উজ্জয়িনী প্রত্যাবৃত্ত খুল্লনা-ধনপতি মিলন পর্যন্ত যে নিটোল কাহিনী গ্রথিত হয়েছে, তার সৌন্দর্য শুধু ঘটনা-বিন্যাসের নিপুণতায় নয়। ব্যক্তি-স্বভাব আর আখ্যানের সাযুজ্য-বিধানে।

ধনপতির দ্বিতীয় উপাখ্যানে গল্পবন্ধে নিবিড় নৈপুণ্য নেই, ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের উপন্যাসোচিত সংসক্তি নেই।

কালকেতু-আখ্যানের রূপটি পৃথক। কতকটা পথের মত। সহজ মানুষের সরল রেখার মতো জীবন। মাঝে মাঝে ঘটনার আবর্তে সামান্য চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু উপাখ্যান আর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের নিশ্ছিদ্র বুনট রচিত হয় নি। কালকেতুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীব্র নয়। বরং অস্বচ্ছ। ফুল্লরারও। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনও দৈবের দান। ঘটনা সেখানে দৈবাদিষ্ট পথে চলেছে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপরে তাকে নির্ভর করতে হয় নি। তাই উপন্যাসোপম গঠনভঙ্গি কালকেতুর গল্পেও মিলবে না।

কিন্তু চরিত্রচিত্রণ এবং বাস্তবরসের জোরে কবিকঙ্কণ চণ্ডী সামগ্রিক ভাবেই উপন্যাসরীতির নিকটের। বিশেষ করে বাংলা পারিবারিক উপন্যাসের যে রূপ গত শতকের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকের মধ্যে মিলেছে, অস্পষ্ট হলেও তার পূর্বাভাস মুকুন্দরামের পরিবার-রসপুষ্ট কাহিনীগুলিতে আছে।

আর ধনপতির প্রথম আখ্যান উপন্যাস-সাহিত্যের একেবারে দরজায় পৌছেছে।

॥ আট ॥ ঘটনা : বর্ণনা : সংলাপ

আখ্যান কাব্যের গঠনভঙ্গির একটি প্রধান সমস্যা ঘটনা বর্ণনা ও সংলাপের সামঞ্জস্য বিধান। এই তিনটি উপাদানই অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু একটা

আনুপাতিক মিলন ঘটা চাই। সে অনুপাত গাণিতিক নয় বলে সূত্র নির্দেশ করা যায় না।

আখ্যান আছে, তাই ঘটনা চাই। কাব্য ব'লে বর্ণনা ছাড়া সে অচল। আখ্যানকে ঘটমান (action) দেখানো এবং বিবরণের (narration) সহ-যোগে তাতে প্রাণসঞ্চারণ প্রয়োজন। আবার এ ঘটনা মানুষের ব'লেই নানা জনের পারস্পরিক কথোপকথন কাহিনীকে বিবরণসর্বস্ব হতে দেয় না। প্রত্যক্ষের বিভ্রম আনে। মানুষের সংলাপ ঘটনার বিবরণের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত।

(গল্প বলার আদি যুগে শুধু ঘটনার বিবরণ ছিল। সংলাপের সঙ্গতি ছাড়া তা কত বিবর্ণ, কত শীতল। ঘটনায় আর সংলাপের মিলনে গল্প-বলা প্রথম আর্ট-এর পর্যায়ে উঠল।) বড় শিল্পী জানেন তিনি কতটুকু নিজে বলবেন, কোথায় গল্পের মানুষদের বলতে দেবেন।

বর্ণনার গুরুত্ব এসেছে কাব্যত্ব থেকে। আখ্যান কাব্যে গল্প বলা হলেও তা কাব্য। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গদ্যের স্বাভাবিক ঘটনা-প্রাধান্য, বিশ্লেষণ তথা বস্তুনিষ্ঠা থাকা সম্ভব নয়। গদ্যের পক্ষেও তেমনি সহজ নয় কাব্যোচিত বর্ণনা, চিত্ররচনা, বর্ণসঞ্চার, ভাবাবেগের অতিরেক। সঙ্গতও নয়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। কাদম্বরী গদ্যে লেখা। কিন্তু সে-গদ্যে কাব্যের চালচলন দুইই আছে। ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যান কাব্যে বর্ণনার স্থান প্রশস্ত। বর্ণনা ঘটনার গতি মন্থর করে দেয়। (ঘটনায় থাকে দ্রুততার ঝোঁক, বর্ণনায় মন্থরতার।)

বিপরীতকে সামরসে বাঁধবার মন্ত্র যাঁর জানা আখ্যানকাব্যে তাঁর সাফল্য। এখানেও নেই কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্বসূত্র। বিচিত্র পদ্ধতিতেই এই অদ্বয় রূপ লভ্য।

কবিকঙ্কণের কাব্য ঘটনাপ্রধান, বর্ণনামুখ্য নয়। এটিও প্রথা মঙ্গল-কাব্যের কবিরা ভাষাচিত্র রচনাকে গুরুত্ব দেন নি। চরিত্রের পাত্রে ভাবাবেগ

অবশ্য নিবেদন করেছেন। দুঃখ-শোকে নাচাড়িতে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস বিতানিত হয়ে উঠেছে। বর্ণনার সুযোগ কিছু এসেছে। রূপরচনায় তাঁদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে কবিদের এ ব্যাপারে আসক্তি ছিল না। আর ঘটনার তুলনায় বর্ণনার পরিমাণ নেহাৎ সামান্য। বর্ণনার বদলে সামাজিক বিবরণ দিতে তাঁরা অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করেছেন।

মুকুন্দরামও এ দলের একেবারে বাইরে নন। অনেকের তুলনায় তাঁর চিত্ররচনায় নিপুণতার ছাপ আছে। কিন্তু এ কাব্যেও বর্ণনাংশ অল্পই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ঘটনাই প্রধান। তবে মুকুন্দরাম নৈমিত্তিক ঘটনাসূত্রেই বেশি উৎসাহ পেতেন। ঘটনায় প্রবল তরঙ্গভঙ্গের অভাব ছিল। সে কথা আগেই বলেছি। ঘটনাক্রম দ্রুত নয়। বলা যেতে পারে বেশ মন্থর। মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ দ্রুতভঙ্গি উত্তেজনা-স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। যেমন লহনা-খুল্লনার কোন্দলে বন্যপশুদের সঙ্গে কালকেতুর বিরোধে, মশানে চণ্ডী কর্তৃক শ্রীপতির প্রাণরক্ষায়। কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী। মুহূর্তের চাঞ্চল্য ক্ষীণস্রোত দৈনন্দিনের পথ ধরেছে। এই মন্থরতা চিত্রপ্রাচুর্যের ফল নয়। ঘটনা-নির্বাচনের বিশিষ্টতা থেকে এসেছে।

বিশেষ করে পুরাণ কাহিনীর বিবরণ (মাঝে মাঝে বেশ দীর্ঘ) সন্নিবিষ্ট হয়ে, তাদের ভাষা ও বাচনভঙ্গির একান্ত বিবর্ণ শীতলতার জন্য গল্পের গতিকে আরও ধীর করে তুলেছে।

বর্ণনার সুযোগ কাব্যে বেশ কয়েকবার এসেছে। কালকেতুর নগরপত্তন, কলিঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, ধনপতি-শ্রীপতির সমুদ্রযাত্রার নানান অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে, আর মশানে সঙ্গিনীসহ চণ্ডীর আবির্ভাবে। কোথাও সে বর্ণনায় সাফল্য আছে, কোথাও নেই। কিন্তু কোথাও কবি মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রাণস্পর্শহীন পদ্ধতিতে কোনো উন্নয়ন সূচিত করেন নি। বর্ণনা আর ঘটনার মধ্যে কোনো সাযুজ্য গড়ে তুলতে পারেন নি। চণ্ডীকাব্যের মামুলি প্রচলিত পথেই তাঁকে চলতে হয়েছে।

কিন্তু সংলাপ রচনায় এবং সংস্থানে কবির কৃতিত্ব প্রশংসা দাবি করতে পারে। ঘটনার বিবরণ-ক্রমে যখনই দুই চরিত্রের বিরোধের ভাব এসেছে, কবি তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সংলাপের সূত্রে বেঁধেছেন। প্রত্যক্ষ কথাবার্তায় বিরোধের সুরটি বেজেছে, বিবরণের একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্য এসেছে, সংঘাতের উত্তেজনায় নাট্যরস জমেছে। এরূপ পরিস্থিতি অনেকগুলিই গড়ে তুলেছেন কবি।

দেবখণ্ড ॥ দক্ষ-সতীর বিতর্ক শিবের মাহাত্ম্য নিয়ে। মেনকা-গৌরীর কলহ, ঘরে জামাই-মেয়ে পোষা প্রসঙ্গে। শিব-গৌরীর বিবাদ দারিদ্র্যের জন্য।

ব্যাধখণ্ড ॥ কালকেতু-ফুল্লরার বিতর্ক গৃহে সুন্দরী নারী দেখে। আংটি ভাঙাতে গিয়ে প্রথমে বেণেপত্নী পরে বেণে মুরারির সঙ্গে কালকেতুর বিবাদ। কলিঙ্গে বন্যাসৃষ্টি করার ব্যাপারে গঙ্গা-চণ্ডী কলহ। ভাঁড়ু-কালকেতুর সংক্ষিপ্ত বিতর্ক, হাটুরেদের উপরে ভাঁড়ুর অত্যাচারের ব্যাপারে। বন্দী কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের কথোপকথন।

বণিক খণ্ড ॥ খুল্লনা-লহনার কলহ ধনপতির অনুপস্থিতিতে। ধনপতির উপস্থিতিতে তাদের আবার কলহ। বণিকদের কলহ। সদাগর-কোটালের বিবাদ সিংহলের ঘাটে। শ্রীপতি প্রসঙ্গে এর পুনরুক্তি।

মুকুন্দরাম কাহিনী-বিন্যাসের এই কৌশলটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এর ফলে নাট্যরসের সহযোগ তাঁর প্রায় নিস্তরঙ্গ কাহিনীকে কতটা উপভোগ্য করে তুলেছে আমরা তা দেখব।

॥ নয় ॥ নাট্যরস : গীতিরস

মুকুন্দরামের এই কাব্যে নাট্যরসের সুযোগ বেশি নেই। কারণ ঘটনার প্রবল উত্তেজনা এর কোনো আখ্যানেই উতরোল হয়ে ওঠে নি। প্রথানুসরণ যেখানে আছে সেখানেও কবি-প্রাণের উল্লাসে তা শিল্পরূপে ধন্য নয়।

তিনটি কাহিনীর মধ্যে যথার্থ বিরোধ-কেন্দ্রিক বৃত্তাকার নাটকীয় সংহতরূপ আছে ধনপতির প্রথম আখ্যানে। নাট্যোচিত দ্বন্দ্বে কেন্দ্রীভূত এই কাহিনীর সামগ্রিক আস্বাদে যে পূর্ণতা অপর দুটি আখ্যানে তার অভাব। কিন্তু সে অভাব পূরণ করার চেষ্টাও আছে খণ্ড খণ্ড বিরোধমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিবরণবিচ্যুত শুদ্ধ সংলাপমুখে তাকে স্ফুরিত করায়।

আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যে বা একালের উপন্যাসে সংলাপ সর্বত্রই থাকে। কিন্তু লেখকের ব্যাখ্যান-বর্ণনার সঙ্গে জড়িত থাকে। নাটকীয় সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যক্তির মুখশ্রী সেখানে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত। উপন্যাসের সংলাপের ভাষায়, সুরে এর কিছু থাকলেও তা বাড়তি লাভ। কাব্যেও। মুকুন্দরাম সোজাসুজি বিরোধ-ঘটনার দুই ধারে দুই পক্ষকে দাঁড় করিয়ে নিজে সরে গিয়েছেন। এদের কথা ব্যাখ্যাবিদ্ধ থাকে নি। এ সংলাপ স্বয়ংপ্রকাশ।

বিরোধপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সংলাপে নাট্যভঙ্গির তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষতা নেই।

পারস্পরিক কথোপকথনের সুযোগটির ব্যবহারে দুটি ভিন্ন রীতি অনুসরণ করেছেন কবি। ফলশ্রুতিও বিভিন্ন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরো একটি পদ—অর্থাৎ একটি গোটা কবিতা জুড়ে একজনেরই কথা। পরের একটি কবিতায় প্রতিপক্ষের জবাব। জবাব তথা অভিযোগও। কিন্তু বেশির ভাগই একটি কবিতায় দু-চার পংক্তি একের, পরের দু'চার পংক্তি অপরের কথা। প্রথম রীতি, দ্বিতীয়ের তুলনায় কিছুটা বিলম্বিত লয়ের। নাট্যরসের জগতে দ্বিতীয় পন্থার নিশ্চয়ই জয়।*

দক্ষের শিবনিন্দা থেকে উদাহরণ নেওয়া থাক। সতী যজ্ঞপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দক্ষকে রূঢ় কণ্ঠে অভিযুক্ত করল শিবকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য। সে অভিযোগ বারো পংক্তিতে দীর্ঘায়ত।

* পুরাতন বাংলা কাব্যে পদ-সমন্বয়ে নাট্যরীতি নির্মাণের উল্লেখ্য চেষ্টা প্রথম দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। সেখানেও এই উভয় পন্থাই সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন কবি এবং সদৃশ ফলশ্রুতিও ঘটেছে।

শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান।
সতী ঝির প্রতি কেন টুটিল সম্মান ॥
ধর্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ।
সবারে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ॥
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥
ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি।
আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি ॥
অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম নিবেদিব কি ॥

এ অভিযোগে বেদনা আছে, অভিমান আছে, চাপা উত্তাপ আছে। এখনও তা ক্রোধে বিস্ফোরিত নয়। দক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট ও বিস্তৃত উত্তরের অপেক্ষা আছে। দক্ষের উত্তরও দীর্ঘ। তাতে শিবের অভব্য আচরণ, অনার্য বেশবাসের কথা আছে, আর আছে ব্যক্তিগত অপমানের জ্বালা। চব্বিশ চরণ জুড়ে এই শিবনিন্দা চলেছে। পরের আঠারো চরণে সতীর উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। উত্তাপ এবারে আর চাপা নেই, উত্তেজনায় ভেঙে পড়েছে। এবং এর পরিণতিতে সতীর তনুত্যাগ।

সতী এবং দক্ষের সংলাপ-বৈপরীত্যের ভিত্তিতে আছে সুকঠিন দ্বন্দ্ব। কিন্তু যেখানে দ্বন্দ্বের ভাব সংগুপ্ত, সেখানে দীর্ঘ বিতানিত কথাবার্তায় নাটকের সুরটি ঠিক বাজে নি। ফুল্লরা-চণ্ডীর কথোপকথনে কৌতুকরসই আস্বাদ্য, সংঘাতজনিত নাট্যরস নয়। কারণ, এদের প্রত্যেকের সংলাপই দীর্ঘ এবং নিজ মনোভাবটি আবৃত করার চেষ্টায় ঠিক আক্রমণোদ্যতও নয়। কিন্তু

প্রত্যেকের সংলাপ যেখানে সংক্ষিপ্ত সেখানে দ্রুততাল সংঘাতের রস অনেক বেশি প্রকাশিত।

আধুনিক কালের নবীনচন্দ্র সেন তাঁর একাধিক কাব্যে স্থানে স্থানে বর্ণনা-বিবৃতি বাদ দিয়ে পাত্রপাত্রীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন সংলাপে। কিন্তু তাঁর একটি কাব্যেও এই পদ্ধতি নাট্যরস সৃষ্টি করে নি। নবীনচন্দ্রের চরিত্রগুলি বক্তৃতা দিয়েছে, তত্ত্বকথা বলেছে। প্রবৃত্তির আলোড়ন, বিপরীত-মুখী মনোভাবের উত্তাপজাত নয় বলে তাদের সংলাপে বর্ণৌজ্জ্বল্য নেই, নাট্যতীক্ষ্ণতা নেই। মুকুন্দরামের সংলাপে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব প্রাণবন্ত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বাস্তব জীবন থেকে বিন্দুমাত্র অনুরঞ্জন ছাড়াই কবি তাদের সাহিত্যের পাতায় স্থান দিয়েছেন, মায় তাদের মুখের ভাষা সমেত।

তবে গৌরী-মেনকার কলহ এবং হর-গৌরীর কোন্দলে সংলাপ অনেকটা রৈখিক। মেনকার ভর্ৎসনা, গৌরীর উত্তরে প্রতি-ভর্ৎসনা। অলস হরের ভোজনবিলাসিতা এবং উত্তরে গৌরীর অনুযোগ। এর চেয়েও নাট্যরস ঘনীভূত যেখানে দুয়ের সংলাপ অন্যোন্য।

(১) কালকেতু। শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥
ফুল্লরা। সতাসতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে।
দোষ না দেখিয়া কর অপমান কেনে॥
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈল লঙ্কার রাবণ॥
আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম।

তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উবশী।
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ॥

... ...

কালকেতু। পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী ॥
সুব্যক্ত করিয়া বামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥

(২) মুরারি। সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥
রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর ॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা বাকী ধরি দেড় বুড়ি ॥
একুণে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ॥

কালকেতু। বীর বলে কিবা আমি দেখেছি স্বপন।
অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সাতঘড়া ধন ॥
কালকেতু বলে খুড়া মুল্য নাহি পাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই ॥

মুরারি। বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।
আমার সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥
ধর্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনাদেনা।
তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥
কালকেতু। কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্যপাড়া॥
মুরারি। বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ না লইও গুণে লও কড়ি॥

(৩) চণ্ডী। সাধিতে আপন কাম আইনু তোমার ধাম
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে
হাজাও রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গে সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥
গঙ্গা। হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সবাকার।
হই গো বিষ্ণুর অংশা কারে নাহি করি হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
দিদি পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ
বড় হই সদয় হৃদয়॥
চণ্ডী। কুম্ভীর মকরগণ প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ
কি কারণে ধর তারে কোলে।

মহাপাপ যার গায় সে পাপী তোমাতে নায়
বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ॥
গঙ্গা গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে বালিঘট করি মরে
সেই বধ তোমারে ত লাগে ॥

গঙ্গা। দুর্গা তার বধে মোর নাই দায়।
পূর্বের করম ফলে আসিয়া আমার জলে
প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায় ॥
ছাগল মহিষ মেষ খেয়ে কৈলা অবশেষ
নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।
স্ত্রী হয়ে করিলা রণ মারিলা অসুরগণ
সমরে করিলা পান সুরা ॥

চণ্ডী। তোরে আমি ভাল জানি পিয়েছিল জহ্নু মুনি
তব জল নাহি করি পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।
উচিত বলিব যদি তোমার সমান নদী
ভুবনে তুলনা দিতে নাই ॥

(৪) কলিঙ্গ-নৃপতি। কোন্ দেশে নিবাস বৈসহ কোন্ গ্রাম।
তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম ॥
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
এত তেজ ধর ব্যাধ কার আজ্ঞা ধরি ॥

আমারে না মান বেটা হইয়া প্রবল।
অচিরাতে পাবে তুমি তার প্রতিফল॥
কালকেতু। বীর কহে গুজরাটে নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার দেশের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥
অবিচার করি রায় মোরে কর রোষ।
পরিণামে জানিবা ব্যাধের নাহি দোষ॥

এর পরে কলিঙ্গরাজ এবং কালকেতু এইরূপ ছয় চরণ করে প্রত্যেকে দুবার তর্কবিতর্ক করেছে।

চারটি কাব্যাংশের কিছু বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়া হল উদাহরণ হিসেবে। কারণ এদের বিশ্লেষণ করলে নাটকীয় ফলশ্রুতির জন্য মুকুন্দরাম কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম উদাহরণটিতে স্বল্পভাষী কালকেতুর কঠিন পৌরুষ এবং কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের বিপরীতে স্থাপিত হয়েছে ফুল্লরার ভর্ৎসনায়-অপমানবোধে-আতঙ্কে-প্রেমে মিশ্রিত ব্যাকুল ও উদ্যতঅশ্রু বাক্‌বিন্যাস।

দ্বিতীয়টি ভিন্ন জাতের। কালকেতুর কথায় সংক্ষিপ্ত ও একাগ্র প্রয়োজন-মুখীতা এখানেও লক্ষ্য করবার মত। এই সংলাপ-বৈশিষ্ট্যে তার ব্যক্তিত্বই প্রতিবিম্বিত। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক মুরারি শীলের কথার ভাব, ভাষা ওভঙ্গী। কয়েকটি মাত্র কথায় তার চরিত্র সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে। মুরারি কালকেতুকে যত ঠকাতে চায় ততই কাজের কথার চারপাশে ছলনাভরা পল্লবিত বাক্য যোজনা করে বেশি ক'রে। তার বহুভণিতাযুক্ত ছলনা কালকেতুর অল্প কথার দৃঢ়তায় প্রতিহত হয়ে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে। মুকুন্দরাম কৌতুকের সঙ্গে শঠ বণিকের ক্রম সঙ্কুচিত সংলাপের ধারাটি লক্ষ্য করেছেন। সংলাপের এই

আকারগত সঙ্কোচ তার শঠবুদ্ধির অতিবিস্তারের ক্রমিক পরাজয় সার্থকভাবে সূচিত করেছে।

তৃতীয় উদাহরণ একটি আদর্শবাদী বিতর্কে আরম্ভ হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সন্ত্রাসবাদী দেবীর আদর্শ এবং গঙ্গার বৈষ্ণবী বোধে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু শুধু ধর্মাদর্শের বিরোধ হয়ে থাকলে এই কাব্যাংশ নেহাতই শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ত। মুকুন্দরাম কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একে পুরোপুরি ব্যক্তিগত দোষদর্শনের গ্রাম্য কলহের এবং প্রায় উচ্চকণ্ঠ গালাগালের স্তরে নিয়ে গিয়েছেন।

চতুর্থ উদাহরণটি শিল্পচ্যুতির নিদর্শন। কালকেতুর মুখে যে মার্জিত বাক্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে কলিঙ্গরাজের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে তা মোটেই চরিত্রানুগ হয় নি। ভারতচন্দ্র এই জাতীয় উত্তরকেই আরও বক্র, আরও প্রসাধিত ক'রে রসান চড়িয়ে সুন্দরের মুখে বসিয়েছিলেন। সে তার যোগ্য স্থান। তবে মুকুন্দরামে এ জাতীয় ব্যর্থতার উদাহরণ বেশি নেই, সংলাপে বিরোধী ভাব ও প্রবৃত্তির সংঘর্ষে নাট্যরস ঘনীভূত করে তোলায় মুকুন্দরাম মূলত সাফল্য লাভ করেছেন।

মুকুন্দরামের নাট্যঘন সংঘাত-সংলাপ প্রায়ই পারিবারিক কলহের রূপ নিয়েছে। অন্তত পরিবারজীবনের নিকটে দ্বন্দ্বাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়েই কবি সার্থক হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খুল্লনা-লহনার বাক্‌বিতণ্ডা। লহনার ছলনামূলক সহানুভূতি প্রদর্শনে আরম্ভ, দুই সতীনের মারামারিতে এর পরিণতি। দুজনের মনোভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং পরিবর্তনের ক্রমটি কোনো ব্যাখ্যান ছাড়াই শুধু সংলাপে আশ্চর্য নিপুণতায় ধরে রেখেছেন কবি। নকল চিঠি নিয়ে লহনা প্রথম কপট কান্না জুড়ে দিল। খুল্লনা এই কান্নাকে আন্তরিক বলে জেনেছিল। চিঠির হস্তাক্ষর দেখে সে লহনাকেই নিশ্চিন্ত করতে চাইল।

খুল্লনা। খুল্লনা বলেন দিদি নাহিগো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস ॥
প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্নছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ ॥

কৌশল ধরা পড়েছে দেখে লহনা ছদ্ম আন্তরিকতার মুখোস ছিঁড়ে ক্রমে বেরিয়ে এসেছে।

লহনা। প্রভুর আজ্ঞায় পত্র যদি লিখে আন।
তবে কি করিতে পারি আমি অল্পজ্ঞান॥
কত কত জন আছে প্রভুর সকাশে।
আনিলেক এই পত্র প্রভুর আদেশে ॥
প্রভুর শাসন তোর এই আইল পাতি।
কাননে চরাহ ছেলি পর খুঞা ধুতি ॥

লহনা এখনও 'প্রভুর আদেশে'র অন্তরালে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু খুল্লনা তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণী। লহনার অভিসন্ধি বুঁঝতে তার বাকী রইল না। সে ভাবল, যে ধনপতি মাথার ময়ুরী করে তাকে এনেছে, সে বিনা অপরাধে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে কেন? তার গলার সুর বদলে গেল, এমন কি আর 'দিদি'-সম্ভাষণও রইল না,

খুল্লনা। কতবা দেখাও মোরে এ গৃহিণীপনা।
আপনা লইয়া তুমি থাকলো লহনা ॥

লহনা। তুই অলক্ষণা লো খুল্লনা পাপিনী।
কোন পাপক্ষণে আইলি দারুণী ॥

সোজাসুজি কলহ বেঁধে গেল এইবার। চিত্র হিসেবে এটি জীবন্ত। নাট্যচিত্র হিসেবেও।

সংলাপদ্বন্দ্ব ছাড়া প্রত্যক্ষ ঘটনাগত সংঘাতের চিত্রও কিছু আছে। যুদ্ধ প্রসঙ্গগুলি রচনা হিসেবে সার্থক নয় বলেই নাট্যরসের দিক থেকে তাৎপর্য-হীন। দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গও পুরাণানুসরণ মাত্র। লহনা-খুল্লনার মারপিটের চিত্রটিই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য আরও বেশি করে কবির কৌতুকহাস্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে।

মুকুন্দরাম স্বভাবত গীতিধর্মী কবি ছিলেন না। কিন্তু কিছু গীতি-উপাদান চণ্ডীমঙ্গলে আছে। আখ্যান কাব্যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি এর প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে। সাধারণভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ভাবপরিমণ্ডলের প্রভাব রূপেও এই ব্যাপারটিকে গণ্য করা যায়।

দ্বিজ মাধবও 'বিষ্ণুপদ' অভিধাযুক্ত কিছু কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা যোগ করে আখ্যানকে বিশেষিত করতে চেয়েছিলেন। পরের যুগে ভারতচন্দ্রও প্রতি অধ্যায়ের গোড়ায় ভক্তিরসাত্মক গান যোগ করে বোধ হয় একই লক্ষ্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন। সুরবৈচিত্র্য, আস্বাদ-বৈচিত্র্যের লক্ষ্য।

মুকুন্দরামের গঠন-নৈপুণ্য অবশ্য এঁদের তুলনায় অনেক উচ্চগ্রামের। কাহিনীকাব্যের আঙ্গিকে বিচ্যুতি না ঘটিয়ে তিনি গীতি-উপাদান ব্যবহার করেছেন।

দ্বিজ মাধব, ভারতচন্দ্রের কাব্যে গীতিকবিতাগুলি আখ্যানের অংশ হয়ে ওঠে নি। মুকুন্দরাম কিন্তু কবিতাগুলিকে কাব্যের ও চরিত্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছেন।

ধনপতির বিরহে বসন্ত সমাগমে খুল্লনার কণ্ঠে এই গানগুলি কবি বসিয়েছেন। ছয় ঋতুর প্রায় প্রথামাফিক বর্ণনা দিতে দিতে বসন্তের অশোক-কিংশুক-পলাশ-কাঞ্চনের রক্তবর্ণ সমারোহে কাম-সেনাপতিকে দেখেছেন। এবং পাঁচটি গানে খুল্লনার বিরহ-বিধুর চিত্ত এখানে বিগলিত হয়ে পড়েছে। কবিতা পাঁচটি হল—

বসন্ত-আগমনে খুল্লনার খেদ। শারীশুক প্রতি খুল্লনা। তরুলতার প্রতি খুল্লনা। কোকিলের প্রতি খুল্লনা। ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা।

খুল্লনার যে-রূপ কাব্যারম্ভে দেখেছিলাম প্রেমকাহিনীর নায়িকা হিসেবে। সতীন-কলহে এবং মাঠে-ঘাটে-বনে ছাগপাল নিয়ে ভ্রমণ করায় তার উপরে ঘন আবরণ পড়েছে। তার সে-নারীরূপ প্রায় ভুলে যাবার মুখে কয়েকটি প্রেম-বেদনার গানে তাকে জাগিয়ে তুলেছেন কবি। এই 'লিরিক' আবেদন কাব্যের আস্বাদ বাড়িয়েছে, বৈচিত্র্য এনেছে। অথচ পরিমাণ-সুমিতির জন্য আখ্যানঘটিত বিশিষ্ট আঙ্গিকের হানি করে নি।

নানা দিক থেকে কাব্যদেহ গঠনে মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় নেওয়া হল তাতে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে কবি প্রথাবদ্ধ একটি কাহিনী-রূপকে সচেতন শিল্পনৈপুণ্যে নবীন আস্বাদের আশ্রয় করে তুলেছেন। প্রথার আগাছা সরিয়ে সে-আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ এক ॥ মধ্যযুগ : চরিত্রভাবনা : মুকুন্দরাম

আমাদের দেশে মধ্যযুগে ব্যক্তি-ভাবনার উদ্ভব হয় নি। কিন্তু শিল্পীরা শুধু মাত্র শিল্প-চেতনার বলে কখনো কখনো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। তাকে রূপায়িত করেছেন। সচেতন সমাজ তথা জীবনচিন্তায় ব্যক্তিবোধের এই সিদ্ধি তখনো বিলম্বিত ছিল।

অবশ্য সামাজিক 'টাইপ' চরিত্রাঙ্কনে অনেক কবিই অল্পাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা, বিজয় গুপ্তের মনসা, বিজয়গুপ্ত-নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর ও বেহুলা। মুকুন্দরাম শেষোক্ত দুজনের তুলনায় অনেক শক্তিমান এবং বড়ু চণ্ডীদাসের চেয়ে ন্যূন তো ননই, আরও মার্জিত। কিন্তু উল্লিখিত চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য তাঁর একটি চরিত্রেও নেই।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধায় সূক্ষ্ম যৌন মনস্তত্ত্বের এক সার্থক ছবি ধরা পড়েছে।[1] বয়ঃসন্ধি থেকে প্রথম যৌবনে পদার্পণের চিত্তগত-চরিত্রগত ক্রমবিকাশ রূপ পেয়েছে। বিজয় গুপ্তের মনসায় বিরুদ্ধ জীবন পরিবেশে এক তরুণীর কোমল স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিগুলি কিভাবে শুষ্ক হয়ে মূর্তিমতী নিষ্ঠুরতা ও সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হল তার চিত্র আঁকা হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে এই দুটিই উল্লেখযোগ্য বিকশমান (dynamic) চরিত্র।

মনসামঙ্গলের প্রথম দিকের কবিরা অর্থাৎ বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেব প্রমুখ চাঁদ সদাগরের যে সুদৃঢ় পৌরুষ এবং আকাশচুম্বি আত্মশ্লাঘার দীর্ণ ট্র্যাজিক মূর্তি গড়েছেন তার তুলনা মধ্যযুগে নেই, নব্যযুগেও অল্পই আছে। তাঁদের বেহুলা চরিত্র-পরিকল্পনা একেবারে ভিন্ন ধাতুর। কোমলে এবং কঠোরে

এমন মিলন দুর্লভপ্রায়। বস্তুজগত থেকে মানুষের চিরন্তন আশার মতই মৃত্যুরাজ্যে তার অভিযান জীবনকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই।

মুকুন্দরাম এ-জাতীয় একটি চরিত্রও রচনা করতে পারেন নি। রাধা বা মনসার মত ক্রমপরিবর্তমান চরিত্রচিত্র আঁকবার চেষ্টা তিনি করেন নি। চাঁদের মত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বেহুলা চরিত্রের ভিত্তিতে যে রোমান্টিক কল্পনা তার সঙ্গে মুকুন্দরামের শিল্পীচিত্তের পরিচয় ছিল না।

মুকুন্দরাম বড় কিছু গড়েন নি। না গল্পে, না চরিত্রে। বাংলা দেশের সমতল মাটির কাছাকাছি কিছু, বাংলার পরিবারজীবনের নিত্য পরিচিত কিছু, অভিজ্ঞতাস্পর্শী বাস্তব কিছু তৈরী করায়ই তাঁর আনন্দ, তাঁর সাফল্য।

মুকুন্দরামের তিনটি কাহিনীতে কাউকে না কাউকে নায়কের ভূমিকা নিতেই হয়েছে। দেবখণ্ডে নায়ক না হলেও নায়িকা থাকার কথা। ব্যাধখণ্ডে কালকেতুর ভূমিকাটিই প্রধান। বণিকখণ্ডের দুটি আখ্যানেই ধনপতির নায়ক-পরিচয় গ্রাহ্য। কিন্তু নায়কোচিত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তথা আদ্যন্ত ঘটনা-নিয়ন্ত্রণী শক্তি এদের কারুর নেই। এদের কর্মকাণ্ডে বিপুলতা নেই, বিস্তৃতি নেই। আসলে মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি চরিত্র-চিত্র। জীবন্ত কিন্তু স্থির। তাদের একটা মূর্তিই সত্য। জীবন-পরিবেশের পরিবর্তনও তার গোড়া নাড়াতে পারে নি, তার বিচিত্র বৃত্তিকে শাখায়িত করে তোলে নি।

মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি জীবন্ত। তাদের আচরণে এবং ভাষায় ধমনীর রক্তচাঞ্চল্য যেন অনুভব করা যায়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে জটিলতা বেশি নেই। দেবখণ্ড বা কালকেতু-আখ্যানের কোনো পাত্রেই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিচয় নেই। তবে ধনপতির প্রথম আখ্যানের কোনো কোনো চরিত্রে জটিলতা কিছুটা আছে।

অবশ্য কবির সব কটি চরিত্রই বাস্তববাদী ভাবনার ফলশ্রুতি। মুকুন্দরামের কবি-প্রাণের বিশিষ্টতার দিক থেকে তাই-ই স্বাভাবিক। পরিচিত

জীবন-পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই এরা আমন্ত্রিত। বস্তুবাদী শিল্পী যে নিষ্ঠায় যে নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতে চরিত্রসৃষ্টি করেন তার অনেকটাই যে কবির আয়ত্তে ছিল এখানে তার প্রমাণ আছে। তার দুটি মুখ্য লক্ষণ কবির সহানুভূতিতে এবং সর্বত্র বর্ষণক্ষম কৌতুকরসে। এই দুটি স্বর্গীয় পদার্থই প্রায় নির্বিচারে দান করেছেন কবি। দুইয়ের সহজ সংযোগে প্রথম বৃত্তির আর্দ্র ভাবালুতা এবং দ্বিতীয়টির ব্যঙ্গধর্মী উৎকেন্দ্রিকতা সংযত হয়েছে। এখানেই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব।

চরিত্র রচনায় কবির অন্যতম কৃতিত্ব বৈচিত্র্যের মহলে মহলে সমান স্বচ্ছন্দে পরিক্রমায়। গ্রাম্য প্রৌঢ়ের ভোজনলোলুপ কর্মবিমুখ বালস্থূলভতা, নাগরিক বণিক নন্দনের স্বভাব-ভ্রমরবৃত্তি, ব্যবসায়ী বেণের বাক্‌বিন্যাসের কৌশলে নিত্যশাঠ্য, অপগতযৌবন নারীর সপত্নীযন্ত্রণা, মহাশক্তিমান ব্যাধের স্বল্পবুদ্ধি বীরত্বের অতিরেক, তরুণীর প্রণয় রোমান্টিক ভাববৃত্তির সঙ্গে উচ্চরব সপত্নী-কলহের মিশ্রণ, ব্যর্থজীবন চতুর কায়স্থ সন্তানের খলতা—মধ্যযুগে একজন কবির সৃজনক্ষমতা এত বিচিত্রকে আয়ত্ত করতে চায় নি, পারেও নি। সীমাবদ্ধ অর্থে হলেও মুকুন্দরাম সম্পর্কে কি বলা যায় না 'Here is God's plenty'। অথচ আশ্চর্য এর দুটি চরিত্রের মধ্যে ঐক্য নেই। চরিত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিস্থিতিগত নয়। ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতেই এই পার্থক্য। মুরারিও শঠ। কিন্তু ভাঁড়ুর পরিবেশে পড়লেও সে ভাঁড়ু হয়ে উঠত না। সতীন-কলহে খুল্লনাও পিছু পা নয়, কিন্তু লহনার সঙ্গে তার গোড়ার পার্থক্য। ফুল্লরা ফুল্লরাই। সম্পদলাভ করেও সে লহনা বা খুল্লনা কারুর চরিত্র-সামীপ্য পায় নি। এখানেই মুকুন্দরাম অনন্য এবং মধ্যযুগে এ শক্তি ছিল একান্ত দুর্লভ।

॥ দুই ॥ শিব : চণ্ডী

বাংলা দেশের শিবের দেশগত কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে, পৌরাণিক দেবতার

সঙ্গে যার গোড়ায় অমিল। যদিও কিছু পুরাণানুমোদিত লক্ষণ আমাদের শিবেও মেলে। সেটুকু সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন বহন করছে। এই দুই উপাদান এত বেশি বিসদৃশ যে মেলাবার চেষ্টা সবটাই ব্যর্থ হয়েছে।

মুকুন্দরাম বাংলা দেশের ঐতিহ্য থেকে শিবকে পেয়েছেন। অনেক পুরাণ বিচার করে পুঁথি লিখেছেন তিনি। তা ছাড়া সর্বভারতীয় হিন্দু পৌরাণিক সংস্কারসূত্রে কিছু কথা এসেছে। তা চরিত্রের মূলে পৌঁছতে পারে নি। আর আছে কালিদাসের কুমারসম্ভবের কিঞ্চিৎ উপাদান। পৌরাণিক হিন্দুর শিব-কল্পনায় যে গম্ভীর সর্বত্যাগী আত্মবিস্মৃত রূপ সত্য, তার সঙ্গে কালিদাসের ভাবনা সুসঙ্গত, কিন্তু বাংলা লোক-কল্পনার মিল ঘটানো অসম্ভব। মুকুন্দরামও সেই অসাধ্যসাধন করতে পারেন নি।

শিব মানুষটি বাঙালি কবিদের কাছে প্রায় কখনই খুব গুরুগম্ভীর চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয় নি। একমাত্র নাথপন্থীদের হাতে ছাড়া শিব চাষী, দরিদ্র গৃহস্থ, ভিক্ষুক অথবা ইন্দ্রিয়শিথিল ব্যক্তিরূপে বাংলা শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলে হাসির খোরাক যুগিয়েছে। কোথাও কখনো যে তাকে ধ্যানস্তব্ধ দেখি নি এমন নয়, কিন্তু কবিরা নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন যে এ নেহাৎই ভাণের ক্রিয়া। বাংলা যাত্রার নারদমুনির ভূমিকার সঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে এর মিল আছে। অবশ্য গোড়ায় আছে পার্থক্য। নারদ হাসিয়েছে কিন্তু নিজে ভাঁড়ের পর্যায় থেকে সমুন্নতি পায় নি। শিব তার যাবতীয় অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও আপন চরিত্রবৈশিষ্ট্যেই আমাদের সস্নেহ সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। বাংলা কাব্যে শিব 'সিরিয়াস' নয়, কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যসমাজের ভাঁড়রূপেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না।

এই সাধারণ পরিচয়ের মধ্যে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন সেকালের দুজন কবি। বিজয় গুপ্ত এবং মুকুন্দরাম। শিব এঁদের শিল্পবুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছে একেবারেই দুটি স্বতন্ত্র দিক থেকে

বিজয় গুপ্তের শিব শিথিলচরিত্র দরিদ্র গৃহস্থ। দেবসমাজে তার সত্যকার

কোনো মর্যাদা নেই, কিন্তু পেছন থেকে মর্যাদাবোধ উদ্রিক্ত করে নারদ প্রভৃতিরা মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে মজা দেখে। অল্প প্রশংসায় সে গলে যায়। তখন বিষ খাবার মত সাংঘাতিক কাজও তাকে দিয়ে অনায়াসে করিয়ে নেওয়া যায়। আবার সামান্যেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাণ্ডব বাঁধিয়ে দেয়। শিবের আনন্দ ও বেদনার প্রকাশে মাত্রাতিরিক্ত শিশুসুলভতা তাকে আরও কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছে। মনসার বিযে চণ্ডীর মূর্ছা দেখে তার উচ্চকণ্ঠে রোদন অথবা বচাই-এর প্রাণ লাভে 'নাচে শিব দিয়া বাহু নাড়া' দেখে চরিত্রটির মূলগত উপভোগ্যতায় কোনো সন্দেহ থাকে না। বিজয় গুপ্তের শিব বিশেষ করে ইন্দ্রিয়দুর্বল ব্যক্তি। শিবের চরিত্রে গৌরীর সন্দেহ, আঁচল বেঁধে নিদ্রা, গ্রন্থি ছিঁড়ে দিয়ে শিবের পলায়ন, ডোমবধূর প্রতি আচরণ, মনসার জন্ম বিবরণ, যৌবনপ্রাপ্ত অপরিচিত মনসাকে দেখে চাঞ্চল্য, এমন কি শোকক্লিষ্ট রূপসী বেহুলার নৃত্যোপভোগের বাসনা সব কিছুই তার চরিত্রের একটি কেন্দ্রের প্রতি নির্দেশ করে। কিন্তু তবু শিব পাঠকদের ভর্ৎসনা ও ঘৃণা জাগায় না। হাস্যের স্পর্শে তাকে লাম্পট্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করেছেন কবি। মুকুন্দরাম শিবের ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্যকে প্রাধান্য দেন নি।

মুকুন্দরামের শিব একবার রুদ্ররূপ ধরেছিলেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার সময়ে। কিন্তু এই পরিচয় পুরাণকাহিনী থেকে সঙ্কলিত। মৌলিক অংশের সঙ্গে এর দূরত্ব অনেকটা। একবার তপস্যায় বসেছিলেন তিনি, কাম ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তাও কালিদাসের প্রভাবে। কপর্দীর সেই নিবাতনিষ্কম্প ধ্যানমূর্তি এবং কামজয়ী তৃতীয় নয়নের অগ্নিদাহ অনুকৃত উপাদান রূপে মাত্র আছে. মুকুন্দরামের লোকায়ত শিবকে তা মহিম্ন সমুন্নতি দিতে পারে নি

কবিকঙ্কণের শিব পত্নীভীত। পত্নীবশও। নিষেধ না শুনেও যখন সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে চলল শিব বিব্রত হলেন, সন্ত্রস্তও। দ্রুত নন্দীকে আদেশ দিলেন যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে। সতীর মৃত্যুতে বালকের মত মাটিতে লুটিয়ে শিবের ক্রন্দন আন্তরিকতার গভীর বর্ণপাতে সার্থক।

অশ্রুমুখে বার্তা কহে নন্দী মহেশ্বরে।
লোটায়ে কান্দয়ে রুদ্র মহীর উপরে ॥
সতি সতি করিয়া আকুল শূলপাণি।
ত্রিজগত নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী ॥

দক্ষযজ্ঞের পুরাণ-কথার মধ্যেও একান্ত মর্তচারী ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করেছেন মুকুন্দরাম দ্বিধাহীন চিত্তে,

শিব-পার্বতীর কাহিনীতে শিবের দারিদ্র্যকে বিশেষ বড় করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই দরিদ্র ব্যক্তিটি একান্ত কর্ম্মবিমুখ। শ্বশুরঘরে নিশ্চিন্ত আহারাদির উত্তম ব্যবস্থায় সে সন্তুষ্ট ছিল। পত্নীর তাড়নায় নিজগৃহে ফিরে আসতে হল। এবং বাধ্য হয়ে ভিক্ষায় বেরুতে হল।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর ভিক্ষায় যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না শিবের।

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইনু বহু ধামে।
সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে ॥

কর্মে যতটা অরুচি আহারে আবার রুচি ঠিক ততগুণ। আহার্য কোথা থেকে আসবে সে ভাবনা নেই। কিন্তু ভোজনবিলাসী মন নানা ব্যঞ্জনের আলোচনা থেকে যতটা সম্ভব রস টেনে নিতে ক্লান্তিহীন। অবশেষে যখন গৃহকর্তা শুনল ক্ষুদকণাও নেই ভাণ্ডারে তখন গৃহিণীর উপরে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। গৌরীর সঙ্গে কলহ শুরু হল। গৃহ ছেড়ে বৈরাগী হবার বাসনা শিব প্রকাশ করতে লাগল।

মুকুন্দরামের শিব যেমন অলস তেমনি লোভী, তার চেয়েও বেশি অবুঝ। এ শিবে মহিমা নেই, কামুকতাও নেই। এ জাতীয় প্রৌঢ় গ্রামীণ মানুষ এদেশের অভিজ্ঞতার সত্য। মুকুন্দরাম নিকট অভিজ্ঞতার জগত থেকে সংগ্রহে ক্রুটিহীন,

কিন্তু বাংলার কোনো কবি শিবকে এতটা কামুকতামুক্ত—একেবারে পুরো

ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যের ঊর্ধ্বচারী করতে চেয়েছেন কি ? এখানে কি মুকুন্দরামের পিউরিটান মনের ছাপ পড়েছে ?

কবি প্রত্যক্ষত চণ্ডীমাহাত্ম্য কাব্য লিখেছেন। কাব্যরীতির দিক থেকে আরাধ্য দেবতার দৈবী ক্ষমতার প্রচুর নিদর্শন কাব্যমধ্যে স্থাপনের বাসনা তাঁর হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য কবির দৃষ্টির বাস্তবতা অতিলৌকিককে বাধাহীন করে তোলে নি। কবির চণ্ডী গোটা কাব্যের নানা অংশে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আদ্যন্ত তার চরিত্র-সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা কবি করেন নি।

সতীই জন্মান্তরে উমারূপে দেখা দিলেন। এ বিশ্বাস ভক্তের। এদের দুটি চরিত্রকে সাহিত্যের দিক থেকে এক করে দেখবার কারণ নেই। সতীর রূপ পুরাণানুসরণে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিবর্ণ নয়। পিতৃগৃহে যাবার আবেদনে বাঙালি বধূর ভাষা তাঁর কণ্ঠে বসিয়ে কবি নিজস্ব বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

উমার কুমারীচিত্র কালিদাসের অনুসরণে আঁকবার চেষ্টা কবি করেন নি। কুমারসম্ভবের ঋণ যেখানে আছে উমা সেখানে প্রায় অন্তরালবর্তিনী। না হলে বিবাহোত্তর জীবন-চিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য অসঙ্গত হত।

বিবাহিতা উমার পিতৃগৃহবাসের ছবিটি যত সংক্ষিপ্ত তত প্রাণময়। আলস্যে খেলায় দিন কাটানো, সংসার-কর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা, মাতার সঙ্গে কলহ এবং তীব্র অভিমান ধনীগৃহে আদরে লালিত কন্যার একটি স্বাভাবিক চিত্র। কৈলাসে স্বামীগৃহে গমনের পরে দারিদ্র্যের চাপে তার আলস্যবিলাসের দিনগুলি পুরোই বিস্মৃত। তবে নিপুণ হাতে নিজের সংসারটি গুছিয়ে চালাবার চেষ্টা কিছুটা আছে। শিবের মত স্বামী নিয়ে অবশ্য তা সম্ভব ছিল না। তার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের অভিমানী-মন একেবারে যায় নি, তার প্রমাণ স্বামীর সঙ্গে তীব্র কলহে এবং সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য অপদার্থ স্বামীর অপেক্ষা না রেখে নিজেই সচেষ্ট হয়ে ওঠায়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী নিজের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য পূজা-প্রচার করতে মর্তে

নেমেছেন, বিশুদ্ধ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নয়। কিন্তু মর্তাগত চণ্ডীর সঙ্গে দেবখণ্ডের উমার চরিত্রগত কোনো সংযোগ নেই। এ সংযোগ আছে মনসামঙ্গলের মনসা চরিত্রে। দেবখণ্ডে তার রুদ্র বক্র ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচিত। তার নিষ্ঠুর সন্ত্রাস-ক্রুর প্রকাশ ঘটল নরখণ্ডের কাহিনীগুলিতে। মনসা নরখণ্ডের একটি প্রধান চরিত্র। নায়কের সঙ্গে সংঘর্ষ, ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায়, জয়ের উল্লাসে, পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও বেদনাবহনে তার জীবন্ত উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করা যায়। চণ্ডীর গুরুত্ব মনসার তুলনায় অনেক কম। ধনপতির প্রথম আখ্যানে চণ্ডীর জন্য বহু চেষ্টায় কাহিনীর অভ্যন্তরে একটি স্থান করে নেওয়া হয়েছে। সে খুল্লনার হারানো ছাগল এবং প্রবাসী স্বামীকে পাইয়ে দিয়েছে। গল্পের প্রধানতম আকর্ষণের সঙ্গে তার বড় যোগা-যোগ নেই। চণ্ডীর কোনো চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই কাব্যের এ অংশে প্রকাশ পায় নি।

ধনপতির দ্বিতীয় আখ্যানে চণ্ডীর সঙ্গেই ধনপতির বিরোধ। চণ্ডী মনসার মত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত। মগরায় নৌকা ডুবানোয়, কমলে-কামিনী ছলনায়, শ্রীপতির প্রাণরক্ষায় চণ্ডী সক্রিয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু দেবীর কোনো স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চরিত্রগত ছবি ফুটে ওঠে নি।

কালকেতু-কাহিনীতেও দেবীর দুই রূপে ভিন্নতা আছে। যে রুদ্রতায় তিনি কলিঙ্গদেশ বন্যাবিধ্বস্ত করে ভক্তের রাজ্য জনাকীর্ণ করে তোলেন, তা মঙ্গল-কাব্যের ধারানুগ মাত্র। কিন্তু যেখানে তিনি কালকেতুকে ধনদান করতে এসে ফুল্লরার সপত্নীভীতি লক্ষ্য করে তাকে নিয়ে অনুচ্চ কৌতুকে মেতে ওঠেন সেখানে কবিধৃত একটি মৌলরূপ প্রকাশ পায়। রসিকা বঙ্গবধূ হিসেবে তাকে চিনতে ভুল হয় না।

কিন্তু দেবখণ্ডের চণ্ডীর সঙ্গে স্বভাবগত বিশিষ্টতায় নরখণ্ডের তিনটি কাহিনীর কোনটির দেবীকেই যুক্ত করা চলে না।

॥ তিন ॥ কালকেতু : ফুল্লরা

একটি পাত্রকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছিলেন "কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোন কাজের নহে।"* ধনপতি ও শ্রীপতির সক্রিয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে, খুল্লনার চরিত্রও একই প্রসঙ্গে বিচার্য। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুর তুলনায় এমন কিছু বেশি নড়িয়া বেড়ায় না। আর কালকেতুর বিকৃত বৃহৎ স্থাণুত্ব সৃষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার ফল নয়, চরিত্রসৃষ্টির এক বিশিষ্ট আদর্শের নিদর্শন।

কালকেতু ও ফুল্লরা অন্ত্যজ ব্যাধশ্রেণীর মানুষ। এই শ্রেণীর নরনারীর জীবন ও মনের বিশিষ্টতার পরিচয় মিলছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়—

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করে সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—**

* নরনারী : 'পঞ্চভূত'। রবীন্দ্রনাথ।

** বসুন্ধরা : 'সোনারতরী'। রবীন্দ্রনাথ।

সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের মানসিক জটিলতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, সুদূর কামনা-বাসনা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু অন্ত্যজ অসভ্য সমাজে চিন্তা ও মননের অতিরেক ঘটে নি। মনের ভূমিকা সামান্যই। দেহবুদ্ধিতে এ শ্রেণীর জীবনবোধের সীমা। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় মানুষদের গাছের সঙ্গে উপমিত করেছেন। "ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতার ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো।

...এই জীবনধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আস্তাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।"*

স্বভাবতই এ-জাতীয় চরিত্র, আমাদের মন-প্রধান জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বেশ খানিকটা স্থাণু বলে বিবেচিত হবে। কালকেতুর জড়ত্ব এই ধরনের। তাই তা কবির সৃষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দেয়।

কালকেতু বীর এবং শিক্ষাসংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে না। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহব্যাঘ্রকে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার কৃতিত্ব। কলিঙ্গ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধেও সে দীর্ঘকাল সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে নি।

* মন: 'পঞ্চভূত'। রবীন্দ্রনাথ।

ধনুঃশর পরিত্যাগ করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আসলে সে কুশলী সেনানায়ক নয়, অমানুষী দৈহিক শক্তির অধিকারী এক মল্ল। পশুসুলভ এই যুদ্ধরীতি অথবা ভোজনবাহুল্য তার চিত্তবৃত্তির আদিম ও অপরিণত গঠনেরই পরিচয় দেয়। দারিদ্র্যের জন্য সে নিত্য হাহাকার করে না, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের স্বল্পতা তার দেহকে পীড়িত করে। অর্থসম্পদের প্রতি তার লোলুপতা না থাকলেও লোভ আছে। শিকারে যেদিন কিছু জোটে না, আহারের চিন্তাই তাকে বিব্রত এবং চিন্তিত করে তোলে। কবি তার মনে পাপপুণ্য ভাবনার যে তরঙ্গ উদ্বেলিত করে তুলেছেন তা অনেকখানি আরোপিত। বাহিরের এত ভাবনাবিস্তারের অন্তরালের আসল কথাটি হল অন্নের জন্য দুর্ভাবনা।

কালকেতু তার ব্যাধজীবনের পরিবেশে চতুর না হলেও একান্ত নির্বোধ নয়। প্রয়োজনবোধে মুরারি শীলের ধূর্ততাকে সে প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু তার এ বুদ্ধির প্রসার বেশি নয়। সম্পদদায়িনী দেবীর প্রতি তার সন্দেহ বালসুলভ অপরিণত বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। গুপ্তধনপ্রাপ্তির সেই প্রসঙ্গ থেকে কালকেতুর বুদ্ধি ও যুক্তির দৌড় কতকটা ছিল বোঝা যাবে।

দুই ঘড়া করে ধন বাঁকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কালকেতু। তৃতীয় বারে যাবার সময়ে দেখল, মাত্র এক ঘড়া ধন বাকী আছে। দেবীকে সেই অর্থের পাহারায় বসিয়ে যাবার ভরসা তার ছিল না।

এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর।
নিতে নারে দেড়ি ভার হইল অস্থির॥
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন॥
যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর।
এক ঘড়া ধন মা গো নিজ কাঁধে কর॥
অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া।

ধন ঘড়া কাঁখে কৈলা বীরে করি দয়া ॥
আগে আগে মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী ॥

তার যুক্তির ধারা অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না যে তার মনের পরিপক্কতা কিছুমাত্র ঘটে নি। সামাজিক ও সাংসারিক কতকগুলি একান্ত প্রাথমিক বোধের উন্মেষমাত্র ঘটেছিল। (এই অপরিণত বুদ্ধিই ধার ও ভারের পার্থক্য বোঝে না, সাত কোটি টাকা মূল্যের মাণিক্য-খচিত অঙ্গুরির তুলনায় সাত ঘড়া ধনই অধিক কাম্য বলে মনে করে।) আপন বুদ্ধির সামান্যতার জন্যই আত্মবিশ্বাস নেই, তাই যুদ্ধজয়ের পরেই ধান্যশালায় পলায়ন তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ব্যাধজীবনের অরণ্য-পরিবেশে সে জীবন্ত ; কিন্তু রাজ্য পরিচালনার বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মাণ। রাজা কালকেতু প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কিছু সক্রিয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু তা কবির বর্ণনামাত্র। রাজারূপী কালকেতুর কোনো বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রচিত্র প্রকাশ পায় নি। নগর-পরিকল্পনা এবং নির্মাণ বিশ্বকর্মা এবং বীর হনুমানের, নাগরিক জনসমাগম ঘটেছে চণ্ডীর চেষ্টায়। গুজরাটের প্রজাকল্যাণকামী ভূমিব্যবস্থা স্বয়ং কবির ভাবনাজাত। প্রজামঙ্গলমূলক এরূপ পরিপক্ক অর্থনৈতিক বিধিবিধান কস্মিনকালেও কালকেতুর মাথায় আসত না, ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল বনচর শিকারজীবী। কৃষকের সমস্যা তার জানবারও কথা নয়। রাজ্যস্থাপনে কালকেতু একমাত্র যে-কাজটি করেছিল তা তারই উপযুক্ত। মল্লযুদ্ধে বনের বাঘ মেরে বসত করা সম্ভব করে তুলেছিল।

আসলে তার সাজানো রাজাগিরি। রাজা কালকেতু রূপশক্তিহীন একটা অস্তিত্বমাত্র

এ-চরিত্র-নির্মাণে দুটি মাত্র স্থানে কবি-দৃষ্টি ঔচিত্যভ্রষ্ট হয়েছে। ছদ্মবেশি চণ্ডীকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত করবার জন্য পুরাণাদির উল্লেখ কালকেতুর পক্ষে যেমন অসঙ্গত, তেমনি অসম্ভব কলিঙ্গরাজের প্রশ্নের জবাবে বক্রচতুর বাক্যে আপন চণ্ডীভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করা।

কালকেতুর চরিত্র-কল্পনার উৎসেও কবির পিউরিটান ভাবনা কার্যকর হয়েছিল। যে মহাবীর তে-আঁটিয়া তালের মতন 'ছোট' গ্রাস তুলে আস্ত একটা হরিণের মাংস শেষ করেও বহুসংখ্যক নেউল পোড়া, অনেক হাঁড়ি আমানির পরেও যার ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না, বন্য পশুদের সঙ্গে দাঁতে-নখে মল্লযুদ্ধ যার স্বভাবগত তার যৌনজীবনের নিরুত্তাপ নীরবতা চোখে না পড়ে পারে না। এর পেছনেও কি কবির অতিশুচিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই সক্রিয় নয়?

ফুল্লরা চরিত্রেও একই শ্রেণী-পরিচয় আছে। প্রাত্যহিক দারিদ্র্যদুঃখ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদার মত চরিত্র তার নয়। তার বারমাস্যার দুঃখের গান তাই অন্য উপাদানে গড়া, ভিন্নতর রসের আকর। ফুল্লরা দারিদ্র্যের বেদনা নিয়ে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে ভাবে না। কিন্তু সতীন নিয়ে জীবনযাপনে তার কঠিন আতঙ্ক আছে। এই আতঙ্কই তাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিতপটুত্ব দান করেছিল। বারমাস্যায় তার কৌতুকমিশ্রিত সুন্দর প্রমাণ কবি দিয়েছেন। ফুল্লরার নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে কিছু উচ্চ ধারণা ছিল। ছদ্মবেশি চণ্ডীকে নানা উপদেশ ও নীতিকথায় যখন বিদায় দেওয়া গেল না তখন সে দারিদ্র্যের পল্লবিত বর্ণনা শুরু করল। কিন্তু সে কৌশলও যখন ব্যর্থ হল তখন ব্যাকুল হয়ে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল। এই একটি মাত্র প্রসঙ্গ ফুল্লরাকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে।

ফুল্লরা সম্ভবত কালকেতুর তুলনায় নিজেকে কিছু বেশি বুদ্ধিমতী মনে করত। এই প্রসঙ্গেই মুকুন্দরামের কৌতুকদৃষ্টি অভ্রান্তভাবে এ চরিত্রের মর্মস্থল ভেদ করেছে। লক্ষণীয়, বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে ফুল্লরা কালকেতুর

স্বল্প-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়েছে, নিজ বুদ্ধির বশে তাকে চালাতে চেয়েছে। তার একটি ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপর্যয়।

দেবী যখন আত্মপরিচয় দিয়ে কালকেতুকে অঙ্গুরীয় দান করলেন, ফুল্লরা চণ্ডীর কার্পণ্যে মুখ বাঁকা করল। কবি লিখ্‌ছেন—

বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ॥
এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্ণাম ॥
এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা ॥

ধারের চেয়ে ভারের মূল্য তার কাছে বেশি। তাই

ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।

কিন্তু অতিবুদ্ধির এই প্রয়োগে ক্ষতি কিছু হয় নি। [দেবদত্ত ধন—অধিকন্তু দোষ নেই। সাত ঘড়া ধনের লোভে তাকে সাত কোটি টাকার আঙ্‌টি হারাতে হয় নি। কারণ দেবী কালকেতুকে কৃপা ক'রে রাজা করবেনই।]

ফুল্লরা দ্বিতীয়বার বুদ্ধির খেলা দেখাতে গিয়ে কিন্তু গুরুতর বিপদ ডেকে এনেছে। কালকেতু কলিঙ্গ রাজ-সৈন্যদের প্রথমে পরাজিত করেছিল। বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনে ফুল্লরা বল্‌ল।

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আইসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥
যদি আছে জীয়ে আশা ত্যজিয়া দেশের বাসা
প্রাণ লয়ে চল মহাবীর।

স্ত্রী-বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী এবারে তা অচিরে প্রমাণিত হল।

সম্ভবত ফুল্লরা চরিত্রের এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধিতে আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারীমাত্রে যে আত্মম্ভরিতা দেখা যায় তার প্রতি কবির কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে।

মুরারি শীল কালকেতু-আখ্যানের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। অবশ্য কাব্যমধ্যে তার ভূমিকা একান্ত সংক্ষিপ্ত। অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী তার উপস্থিতি। কিন্তু রচনা-কৌশলে পাঠকের মনে সে একটি অনপনেয় ছাপ রেখে যায়।

মুরারির চরিত্র-ভিত্তিতে আমরা অতি সাধারণস্তরের একটি কপট বণিক-বৃত্তি লক্ষ্য করি। কিন্তু তাকে অসাধারণ করে তুলেছেন কবি তিনটি উপায়ে। স্ত্রীর সাহচর্য। বাক্‌বিন্যাসের পটুত্ব। কৌতুকরসের সহযোগ। একটি শঠ ব্যবসায়ীর চরিত্র, কাহিনীর নায়ককে প্রতারিত করবার জন্য তার চেষ্টার ভূমিকা নিয়েই যে কাহিনীতে স্থান পেয়েছে তার উপস্থাপনায়ও কৌতুকরসের স্পর্শ এনেছেন কবি। তার শঠবুদ্ধি, তার আচরণ এবং বাক্‌চাতুর্য সব মিলে আশ্চর্য সংহতি, অথচ সব কিছু জড়িয়ে একটা মৃদু ব্যঙ্গের স্পর্শ—একটি সংযত হাস্যের রেশ।

মুরারি-চরিত্রের চালচিত্রে তার স্ত্রীকে স্থাপিত করেছেন লেখক ; ফলে সে উপযুক্ত পটভূমি পেয়ে আরও জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। কালকেতুর সাড়া পেয়ে মুরারি বাড়ির পেছনে পালিয়েছে। স্ত্রীকে কোনো উপদেশ তার দিতে হয় নি। পাওনাদারকে ফেরাবার কৌশল তার অজানা নয়। কালকেতুকে সে নির্বিকার চিত্তে আরও কিছু পণ্যের জন্য হুকুম করে বসল।

বীরের বচন শুনি আসিয়া বলে বেণেনী
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার॥
আজি কালকেতু যাহ ঘর।

কাষ্ঠ আন এক ভার হাল বাকি দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥

শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে তাকে আঘাতে বিপর্যস্ত করার এই রণকৌশল বড় বড় সেনাধ্যক্ষদেরই মাত্র করায়ত্ত।

কিন্তু প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতেও সে জানে। কালকেতুর কাছে সোনার আঙ্টি আছে শুনে বেণেগিন্নীর মুখের চেহারা কেমন বদলে গিয়েছিল কবি তা স্মিতমুখে লক্ষ্য করেছেন

মুরারির স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। সে আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। তুরূপের তাস এখনো দেখানো বাকি। মুরারি শাঠ্যে, বাক্‌ভঙ্গীতে সত্যই তার স্ত্রীর 'পতিদেবতা'। কবি মুরারিকে রঙ্গমঞ্চে আনবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। বেণেনীর ভূমিকাভিনয় শেষ হয়েছে। একটি মনোরম চরিত্র পূর্ণ করবার লোভে পড়ে কবি সংযমচ্যুত হন নি।

কালকেতুর আগমনে কোটীপতি বণিকের দেড়বুড়ি ঋণ শোধের ভয়ে খিড়কীতে পালানো, আঙ্‌টির কথা শুনে 'আসিতে বীরের পাশ ধায় বেণে খিড়কীর পথে।'

কালকেতুকে দেখে সে কিন্তু পুরাতন ধারের কথা তুলল না আঙ্‌টি ক্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা দেখালো না, কালকেতুর কুশলসংবাদের জন্য আন্তরিক কাতরতা ব্যক্ত করল। কালকেতুর মত সহজবুদ্ধির মানুষ এই জালে অনায়াসেই ধরা পড়ল। বিক্রেতার মনটিকে একটু নরম করে সে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসল জায়গায় কঠিন আঘাত করল—

সোনা রূপা নহে বাবা এ বেঙ্গা পিতল
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জল॥

মুরারির ব্যবসায়ী বাক্‌চাতুর্য সম্বন্ধে আমরা আগের পরিচ্ছেদে সংলাপ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। মুরারির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তার মধ্যে

চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে। কালকেতুকে বশ করবার জন্য মুরারি একাধিকবার তাঁর সঙ্গে হৃদয়সম্পর্ক একটু বেশি জোর গলায় ঘোষণা করেছে। কালকেতুর অদর্শনে কাতরতা প্রকাশ করে তার আবির্ভাব। কালকেতু যখন তার কথার জালে বিশ্বাস করল না, সে আবার তার সঙ্গে পিতার কাল থেকে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা পাড়ল।

মুরারির চরিত্রটির আয়োজন অল্প। চরিত্রটির কল্পনাটিও টাইপ ধরনের। কিন্তু তার মধ্যেই সাফল্যের উচ্চ সিদ্ধি।

এই চরিত্রটির মূল ভাবনাও মুকুন্দরামের নিজস্ব। দ্বিজ মাধব প্রভৃতিতে এ চরিত্রের উল্লেখ নেই।

ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের পাতা থেকে বাঙালির মানসলোকে আসন নিয়েছে। কালকেতুর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা চলে। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অবশ্য মুকুন্দরামের মৌলিক কল্পনার সৃষ্টি নয়। অপরাপর চণ্ডীমঙ্গলে তার দেখা পাই। কিন্তু মুকুন্দরামের ভাঁড়ুই রচনা-সৌকর্যের দিক থেকে উজ্জ্বলতম।

ভাঁড়ুকে শেষ পর্যন্ত 'ভিলেন'-রূপে দাঁড় করানো হয়েছে। কাব্যকাহিনীর দিক থেকে সেখানেই তার গুরুত্ব। ভাঁড়ু যে দুষ্ট প্রকৃতির অসৎ চরিত্রের লোক প্রথমাবধি তার পরিচয় কবি দিয়েছেন। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তাকে শেষ পর্যন্ত ভিলেন করে তুলেছে। মুকুন্দরাম তার এই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট চরিত্র-পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি। তার ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি আবিষ্কারে বিশেষ যত্ন করেছেন। চরিত্র-ভাবনায় এ জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি মধ্যযুগের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য-প্রায়।

দ্বিজ মাধবের ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটিও একান্ত মামুলি নয়। কবি এই খল চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, আপন মনের সহানুভূতির আলো ফেলে। তার খলতার পশ্চাতে একটি বেদনাবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিঃসম্বল ভাঁড়ু দত্তের জীবিকার্জনের ক্ষমতাও নেই—

ভাঁড়ু দত্ত ডাকি বলে তপনদত্তের মা।
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা ॥

ছলনা আর কয়েকটি কানা কড়ি মাত্র সম্বল করে সে হাটুরেদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আর পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। মাছের হাটে টানাটানিতে তার কোঁচড় থেকে ভাঙা কড়ি কটি পড়ে গেল। সেই পরিস্থিতির অপমান ও বেদনাটুকু ধরে রেখেছেন দ্বিজ মাধব।

মুকুন্দরাম ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে দেখেছেন কাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা না পাওয়ায় একটি বিপর্যস্ত চিত্ত-কেন্দ্র। ভাঁড়ু নিজের বংশকৌলীন্য এবং বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করত। কিন্তু তার ক্ষমতার পরিমাণ কতদূর কবি ভাঁড়ুর প্রসঙ্গ তুলেই সে কথা বলেছেন। বানের জলে সাঁতার কেটে বাঁচার শক্তিও তার নেই।

উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।
জটে ধরি পত্নী মোরে করিল নিস্তার ॥

আসলে তার দম্ভমাত্র সম্বল। শুধু কাপট্যের মূল্যে, শাঠ্যের কৌশলে সে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়। কালকেতুর সভায় তার আগমনের ছবিটি ভাঁড়ুর চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ করেছে।

ভেট লয়ে কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম লম্বমান ॥
প্রণাম করিয়ে বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥

কিন্তু জীবনে কাম্য সেই মর্যাদাপ্রাপ্তি ঘটে নি। সামাজিক মানী ব্যক্তিদের

বিরুদ্ধে তাই তার জাতক্রোধ। বুলান মণ্ডলকে প্রজামুখ্যের সম্মান দিলে সে ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারে না—

দিয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।

ভাঁড়ু দরিদ্র, ভাঁড়ু ক্ষমতাহীন। অথচ তার তুল্য যোগ্যব্যক্তি দুর্লভ। সে ভাগ্যতাড়িত। এই ভাবনা তার মনকে সমাজের প্রতি বিষিয়ে রেখেছে। কালকেতুকে তাই অকারণেই প্রজাশোষণের উপদেশ দিতে তার বিকৃত আনন্দ—

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধনে দিবে নাগা।

ভাঁড়ু হাটে গিয়ে পণ্যদ্রব্য লুঠে নিয়ে আসে। কারণ তার বাঁচার অন্য পথ নেই। সে স্বভাবতই শাঠ্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছিল। অপরের ক্ষতি সাধনে এক ধরনের বিকারগ্রস্ত সুখ সে অনুভব করে। এবং নগরের মণ্ডল না হয়েও বহুকাম্য মণ্ডলত্বের ভূমিকাভিনয়ের ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ সে পেতে চায়।

কালকেতুর হাতে অপমানিত হয়ে সে কলিঙ্গরাজের আশ্রয় নিয়েছে। কালকেতুর প্রতি তার ক্রোধ অবশ্য পূর্বপোষিত। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু আজ নগরপতি, আর কায়স্থকুলতিলক, বুদ্ধির মূর্তিমান ভাস্কর ভাঁড়ু অর্থহীন, সহায়হীন ভিক্ষুক। এই জ্বালা সে হঠাৎ প্রকাশ না করে পারে নি উত্তেজনার মুহূর্তে—

তিন গোটা বাণ ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈবযোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল॥

অবশেষে অপমানিত ভাঁড়ু দত্ত ভিলেনে পরিণত হল। নিঃসন্দেহে

কালকেতু-আখ্যানে ভাঁড়ু দত্তই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বোধের পরিচয় আছে।

॥ চার ॥ ধনপতি-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা

ধনপতির আখ্যানে দুটি কাহিনী। ধনপতি উভয় কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র। কিন্তু তার চরিত্রে দুটি কাহিনী জুড়ে আদ্যন্ত সঙ্গতি আছে এমন কথা বলা চলে না। দুই কাহিনীর ধনপতি যেন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

ধনপতি ধনীর সন্তান। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদভোগে অলস জীবন মসৃণ পথে বয়ে চলেছে। বাণিজ্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত দুর্ধর্ষ পৌরুষের ইঙ্গিতমাত্র তার মধ্যে নেই। ধনপতি পায়রা নিয়ে কৌতুকক্রীড়ায় দিন কাটায়।

কবি তার চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু দেখেছেন ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে। কর্মহীন অলস জীবন, পারাবত-ক্রীড়ায় দিনপাত, সঞ্চিত সম্পদভোগ এবং ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য যেন সহজ সম্বন্ধে যুক্ত। ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনা প্রায় বিগত যৌবনা। বণিকপুত্রের ভোগবাসনা তাই নবীনা কিশোরীর প্রতি উন্মুখ। প্রথম দর্শনেই খুল্লনার প্রতি সে আসক্ত হয়েছে।

কিন্তু সেকালের ভোগী পুরুষদের সাহস তার ছিল না। লহনাকে মনে মনে সে ভয় করত। পারিবারিক শান্তিরক্ষার আগ্রহও তার ছিল। তাই কামুক ও চরিত্রদুর্বল পুরুষের প্রচলিত রীতিতে লহনাকে অলঙ্কারাদি এবং প্রচুর ভাল কথার উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে হয়েছে।

ধনপতি রাজার জন্য সোনার খাঁচা তৈরী করতে গৌড় নগরে গেল। দায়িত্বটি এমন যাতে পুরুষের গৌরব ও দার্ঢ্য নাই। সেখানে পাশাখেলায় এবং আনুষঙ্গিক নারীসাহচর্যে তার দিন কাটতে লাগল। ঘরের কথা সে প্রায় ভুলেই গেল। মুকুন্দরাম এই দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ মাত্র করেছেন। বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি। তার কারণ দুটি। প্রথমত, একালের

নীতিঘটিত জিজ্ঞাসা সেকালে কোনো সমস্যাই ছিল না। দ্বিতীয়ত, চরিত্র-বিশ্লেষণের পদ্ধতি সেকালের কাব্যশিল্পে অজ্ঞাত ছিল।

ধনপতি ঘরে ফিরে খুল্লনার লাঞ্ছনার কথা শুনল। কিন্তু লহনাকে সামান্য ভর্ৎসনা ছাড়া আর কিছুই ঘটল না। খুল্লনাকে বিবাহ করে তার নিজের মধ্যেই কি কোন বিবেক-দংশনের সৃষ্টি হয় নি?

ধনপতির যে বণিকবেশ দেখানো হয়েছে তা পূর্বপরিচয়ের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন। তাছাড়াও বণিক ধনপতি স্বতন্ত্র চরিত্রচিত্র হিসেবেও আমাদের বিশ্বাস জাগায় না। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের চরিত্র-কেন্দ্রে যে-ভাবকল্পনা তার অনুসরণ করতে চেয়েছেন কবি। সে চেষ্টা সফল হয় নি। ঐ জাতীয় দৃঢ় পুরুষকারের ছবি আঁকায় কোনো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না মুকুন্দরামের। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেছিল। এই কাজটি গুরুতর, কিন্তু এর পেছনে কোনো বিশেষ চরিত্রগত কারণ দেখানো যায় নি। ধর্মাদর্শের এবং জীবন-চেতনার এমন কোনো কঠিন প্রত্যয় তার ছিল না যার জন্য জীবনপণ করে দৈবশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায়। সে হঠাৎ চণ্ডীকে অপমান করেছে, দেবতার বিরুদ্ধতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মঙ্গলদেবী তার শক্তির প্রবল মাহাত্ম্য ঘোষণা করবার একটা সুযোগ পেয়েছে।

নৌযাত্রা প্রসঙ্গে ধনপতির অনভিজ্ঞতা, কালীদহে কমলেকামিনী দর্শনের বিভ্রম, সিংহলে বাণিজ্য ব্যাপার এবং চণ্ডীর কোপে কারাবাস তার চরিত্রের কোনো বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করে নি। তবে দীর্ঘ বারো বছর কারাবাসের পরে গৃহ প্রত্যাবর্তনের আকুলতা খণ্ডচিত্র হিসেবে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

খুল্লনার চরিত্র মুকুন্দরামের সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন—বলা যেতে পারে কতকটা প্রতিনিধিত্বমূলক। খুল্লনার কথা আরম্ভ হয়েছে রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীর নায়িকার সুরে বেঁধে আর শেষ হয়েছে পুত্রস্নেহ ব্যাকুলা বঙ্গজননীরূপে। ধনপতির খেলার পায়রা যখন উড়ে গিয়ে খুল্লনার

আঁচলে লুকালো, ইন্দ্রিয়-দুর্বল তরুণ সদাগরপুত্রের চোখের ভাষা কি খুল্লনা পড়তে পেরেছিল? তাদের সেই প্রথম সম্ভাষণে কৌতুকের অন্তরালে নিশ্চিত পূর্বরাগের ঈষৎ বর্ণসম্পাত ঘটেছিল।

ধনপতি। কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরি।
পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি ॥
অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্বজনে।
লুকায়ে রাখিলা তাহা ঝাঁপিয়া বসনে ॥
পারাবত দিয়া মোরে করহ পীরিতি।
নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি ॥
সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী।
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী ॥
বনিতা জনের ঠাঁই নিতে পারি বলে।
পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলা আঁচলে ॥

ধনপতির ভাষা বহুস্থলে দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে। তার পরোক্ষ অর্থে নিঃসন্দেহে চিত্তমুগ্ধতার স্পর্শ লেগেছে।

খুল্লনা পরিচয় জেনে সম্পর্কে ভগ্নীপতি বলে বুঝল। অন্যথায় সেকালের বাঙালি মেয়ের পরপুরুষের সঙ্গে কৌতুক-আলাপ এতটা অবধি প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু তার কৌতুক-কথায় কি অন্যতর কোনো সুরের ব্যঞ্জনা নেই?

খুল্লনা। ঈষদ হাসিয়া বামা করে উপহাস।
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড আশ ॥
আজিকার মত ছাড় মাংস অনুরোধ।
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ ॥
প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন॥

দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিথ্যা কার্য্যে কর সাধু কপট চাতুরী॥
তুমি ত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা॥

খুল্লনার ভাষার সেই ব্যঞ্জনা বুঝতে ধনপতিরও বিলম্ব হয় নি :

পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্যগতি।
এ কন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি॥

কবি এ বিষয়ে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন দেখা যাচ্ছে।

খুল্লনার এই প্রণয়িনী নায়িকামূর্তি আর একবার প্রকাশ পেয়েছে। কাননে ছাগল রাখার অশেষ কষ্টের মধ্যেও যেদিন বসন্ত এল, তার দেহগত সব দুঃখ ছাপিয়েও হৃদয়ের বিরহ-ব্যাকুলতাই বড় হয়ে উঠল। নিত্যকার সংসারজীবনে যন্ত্রণা অনেক। সেখানে খাদ্যবস্ত্রের অভাবের দুঃখ, সতীন-কলহের বিড়ম্বনা। এরই মধ্যে সুপ্ত খুল্লনার নারীচিত্তের হঠাৎ জাগরণ বসন্তের দিনে। তা যেন একটা অকস্মাৎ উচ্চারিত সঙ্গীতের তান। কবি এই স্বাতন্ত্র্যটুকু ধরে রেখেছেন, কয়েকটি গীতিলালিত্যে—পাঁচালীকাব্যের ঘটনা আর বিবরণ-প্রাচুর্যের মধ্যে একটি পুষ্পিত লতার মত তা কম্পিত।

কবি এ খুল্লনাকে একান্ত করে রাখেন নি। প্রণয়-নায়িকার কমনীয়তা ও কল্পনা-মাধুর্য থেকে তাকে সংসারজীবনের কর্কশ বাস্তব রথের চাকায় বেঁধেছেন। সে শুধু লহনার দ্বারা অত্যাচারিতই হয় নি। লহনা গায়ের জোরে জিতেছে। খুল্লনা জিতলে লহনার ভাগ্যেও কম লাঞ্ছনা জমা হত না। কলহে খুল্লনার পারদর্শিতা কম ছিল না। মর্মান্তিক আঘাত করতে সেও জানত। লহনার বিগতযৌবন এবং বন্ধ্যাত্বের প্রতি তার তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ লক্ষ্য করবার মত।

খুল্লনাকে মুগ্ধা এবং লহনাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলা সম্ভব নয় সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী। প্রথমায় প্রগল্‌ভতার এবং দ্বিতীয়ায় মুগ্ধতার লক্ষণ

কিছু আছে। হয়ত সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব এক্ষেত্রে বর্তেছিল। অবশ্যই ধনপতি-লহনা-খুল্লনায় মিলে প্রথম কাহিনীটি হয়ে উঠেছিল কতকটা সংস্কৃত নাটকের ত্রিভুজ প্রেম-আখ্যানগুলির মত।* কিন্তু চরিত্রভাবনার গোড়ায় পার্থক্য আছে। মুকুন্দরামের পাত্রপাত্রীরা সবাই বাংলাদেশের পরিবার জীবনের মানুষ। সংস্কৃত নাটকের নরনারীদের আভিজাত্যের অধিকারী তারা নয়। তাদের সপত্নীদ্বেষ, তাদের অভিমান অন্যপথ ধরে প্রকাশ পেত। মুকুন্দরামের খুল্লনা-লহনা যে-ভাবে কলহ করেছে, যে-ভাবে তাদের কলহ মারামারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রাম্যতার শিল্পসিদ্ধি ঘটেছে, আভিজাত্য নিশ্চয়ই নেই। আর খুল্লনা এ কলহে শুধুই নির্যাতিতা নয়—শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিতা হলেও। কলহের হাতাহাতির কলাকৌশলও তার কাছে অজ্ঞাত নয়।

এর ফলে খুল্লনাচরিত্রের নায়িকাসুলভ কমনীয়তা বিঘ্নিত হয়েছে। পরবর্তী অশ্রুপ্রবাহও এই তুচ্ছতা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে নি। কিন্তু এখানেই মুকুন্দরামের চরিত্রভাবনার বিশিষ্টতা। খুল্লনার মধ্যে প্রণয়িনী তরুণীর কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন কবি, কিন্তু তাকে সংসার-বাস্তবতাচ্যুত রোমান্টিক কামস্বর্গের কল্পরূপিণী করে তুলতে চান নি। প্রেমলালিত্য সপত্নীকলহ, সন্তানস্নেহ-ব্যাকুলতা এদের মধ্যে সহজ সমন্বয়ে সমস্যা নেই। মুকুন্দরাম এইরূপ আপাতবিপরীত উপাদানকে নির্দ্বিধায় একটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিলিয়েছেন। অবশ্য খুল্লনার সপত্নী-দ্বেষের মধ্যে তার যৌবন-সৌন্দর্যের গর্ব কতটা সক্রিয়, কবি তা দেখিয়েছেন।

পরিণতিতে খুল্লনার মাতৃমূর্তির যে ছবি এঁকেছেন কবি তা সংক্ষিপ্ত হলেও উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট। এমন কি লহনা যখন তার হারানো সন্তান সন্ধানকে কেন্দ্র করে কুৎসায় মেতে উঠেছিল, তখনও সে বিরুদ্ধতায় শাণিত হয়ে ওঠে নি।

* কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' 'বিক্রমোর্বশী'; শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' প্রভৃতি সুখ্যাত নাটকের নাম করা যেতে পারে।

বরং সতীনের কথায় 'পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়।' মাতা খুল্লনা সন্তানস্নেহে বিগলিত এক উন্নততর অস্তিত্ব ; অনায়াসে সে যেন সতীন-কলহের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।

কিন্তু খল আর শঠের তির্যকতা অঙ্কনে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার বিশ্লেষণে মুকুন্দরাম আরও সার্থক। তাঁর সবচেয়ে সুঅঙ্কিত চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত এবং লহনা—কেউ এরা ভালো মানুষ নয়। কিন্তু ভালোমানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশি উজ্জ্বল, সাহিত্যরসিকের কাছেও এরা অনেক প্রিয়।

খুল্লনা প্রসঙ্গে লহনার ষড়যন্ত্র এবং বলপ্রয়োগ তার হীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। খুল্লনার সঙ্গে সমবেদনাও সৃষ্টি করেছেন লেখক। সরল রেখায় দেখলে লহনার প্রতি বিশুদ্ধ ঘৃণা হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু মুকুন্দরাম সহানুভূতি বর্ষণ করে তাকে সামান্য ঘৃণা থেকে উদ্ধার করেছেন। এর জন্য কবিকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করতে হয়েছে।

ধনপতি খুল্লনাকে যখন বিবাহ করতে চাইল লহনার কাছে সে-সংবাদ কতটা নিদারুণ হয়ে বেজেছিল কবি তা লক্ষ্য করেছেন। তার সাজানো সংসারে অপরের কর্তৃত্বের কল্পনাও বড় ভয়ানক বলে মনে হল। ধনপতির ইন্দ্রিয়-দুর্বল চরিত্রের কথাও তার অজানা নয়। ভবিষ্যতে তাই শুধু অন্ধকারই সে দেখল।

পায়রা উড়ান ব্যাজে গেলা প্রভু নিজ কাজে
নাহি জানি এসব বারতা।

লক্ষণীয় 'নিজ কাজ' কথাটি। স্বামীর চরিত্রের শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত তার কাছে স্বচ্ছ। কিন্তু আসল দুঃখ তার দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা ঘরে সাক্ষাৎ উপদ্রব স্বরূপ, সব কিছুতে সম অংশীদার এক নবীনার আবির্ভাব। এ আশঙ্কা তাকে অপমান ও ঈর্ষায় কাতর করে তুলেছে—

বিধাতা হইল বাম পরে নিবে ধন ধাম
মন পোড়ে তুষের আগুনে ॥
শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
এ শেল রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে
সঞ্চয় করিয়া ঘর বাড়ী ॥
বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাম খাট পিঁড়ি
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
কারে দিব মন্দির মশারি ॥

পরিবার-তন্ত্রে দীক্ষিত কবি মুকুন্দরাম। বাহির থেকে দেখতে গেলে যা অকিঞ্চিৎকর, তার মধ্যে কত গভীর বেদনা জমা বেঁধে থাকতে পারে মুকুন্দরাম তা সহজেই অনুভব করেছিলেন।

ধনপতি অবশ্য সুচতুর ব্যক্তি। মনস্তত্ত্বজ্ঞান তার সুপ্রচুর। প্রথমা স্ত্রীকে যে স্তোকবাক্যে ভুলাবার চেষ্টা সে করেছিল তা প্রায় অমোঘ। লহনার কষ্ট লাঘব করবার জন্যই তার এই আয়োজন। কিন্তু লহনা ধনপতিকে জানে। তাকে ভোলানো গেল না। বরং ধনপতির কৈফিয়ৎ একটি কঠিন সত্যকে খুব তীব্রভাবেই প্রকট করে তুলল। লহনার যৌবন পাকশালেই বিনষ্ট হয়েছে। সংসারের কর্ম ও কর্তব্যচক্রে তার লালিত্য আজ অপগত। যে ভাবনাকে মনের সচেতন স্তরে নিয়ে আসতে চায় নি লহনা, অবচেতনে তা নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছিল। স্বয়ং ধনপতিই তার মনের আবরণের প্রথম গ্রন্থিমোচন করল।

ধনপতি কিছু উৎকোচ দিয়ে স্ত্রীকে বশ করল ভেবে নিশ্চিন্ত হল। লহনাকে নীরব হতে হল উপায়হীনতার জ্বালা বুকে নিয়ে। এর কারণ রয়েছে ধনপতির ভোগলালসায়, তার নিজের যৌবন আকর্ষণের শিথিলতায়। সে কারণ তার আয়ত্তের বাহিরে।

তবুও লহনা নবযৌবনা খুল্লনার সঙ্গে সম্প্রীতির সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। কনিষ্ঠার প্রতি স্নেহকেই একান্ত করে তুলেছিল। নিজের প্রবৃত্তির সহস্রশীর্ষ সর্পকে দমন করবে ভেবেছিল। দুর্বলা উপদেশ দিল—

খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।
ওই ছাড়াইবে তোমা সোয়ামীর কোল॥
কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
কদম্ব-কোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥

এ উপদেশ দুর্বলার, তার দুর্বল মনেরও। এই চিত্তকেন্দ্র—ঈর্ষার জ্বালা, অপগত যৌবনের যন্ত্রণা, অপমানবিদ্ধ রুক্ষতা থেকেই তার খুল্লনার প্রতি শত্রুতার সূত্রপাত।

লহনা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রে ততটা পারদর্শী নয়। না হলে লীলাবতীকে ডাকতে হত না। এবং অনেক ষড়যন্ত্র করেও প্রবল ঝগড়া, প্রবলতর গায়ের জোর প্রয়োগ করে তাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হত না। লক্ষণীয়, লহনা খুল্লনার যে শাস্তির ব্যবস্থা করল তা যৌবন-সৌন্দর্যনাশি। লহনার স্বামীর উপর অধিকার হারাবার অপর কারণ তার বন্ধ্যাত্ব। আবার স্বামীকে সতীনের হাতে তুলে দিয়েও সন্তানস্নেহ আশ্রয় করে বাঁচা যায়। বাৎসল্যের প্রশান্তি নারীকে অনেক জ্বালা থেকে উর্ধ্বচারী করতে পারে। লহনার বন্ধ্যাত্ব একটি ঘটনামাত্র নয়। তার চরিত্রের অপর একটি জট।

কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে লহনা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। তবে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাকালে খুল্লনার প্রতি শেষবারের মত শত্রুতা সে করতে ছাড়ে নি। এমন কি নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত জ্বালা সর্ববিধ

কল্যাণচিন্তাকে বিকৃত করে ফেলেছে। স্বামীর বিদেশ গমনে তার প্রার্থনায় এই চিত্ত-বিকৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি।

স্থয়া তুয়া সমান হৈল এবে হৈল ভাল।
বিক্রম কেশরী জীয়ে থাকুক চিরকাল ॥
তোমার চরণে দুর্গা মাগি এই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ॥…
জীয়ন্ত পতিতে যার কিছু নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুঃখ ॥

লহনার মনোভাব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে খুল্লনা পুত্রবতী হওয়ায়। নিজের বন্ধ্যাত্বের বঞ্চনা তাকে অন্তরে অন্তরে আরও বিক্ষত করেছে।

খুল্লনার নবজাত পুত্রকে নিয়ে যে বাৎসল্য-মহোৎসব, কৃষ্ণ-কথার প্রসঙ্গ তুলে কবি তার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সেখানে দুর্বলা দাসীর প্রবেশ আছে। কিন্তু তারই গৃহ-প্রাঙ্গণের এই নিত্য শিশুলীলায় লহনা অনিমন্ত্রিত। এ শুধু বেদনা নয়, এ তার অপমান—সবচেয়ে বড় পরাজয়। কবি ইঙ্গিতে একবার লহনা-চিত্তের অন্দরের এই কথা জানিয়েছেন। খুল্লনা নগরের পথে পথে সন্তানের সন্ধান করছে, লহনার সুপ্রচুর কুৎসার মধ্য দিয়ে হঠাৎ মনের গোপন বেদনাটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—

দু-বহিনী দু-সতিনী বসি একবাসে।
আঁখির তারা পো হারা মোরে না জিজ্ঞাসে ॥

দুর্বলা দাসীর চরিত্রটি একান্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই টাইপ চরিত্রটিকে কবি প্রাণদান করেছেন। শুধু প্রাণদানই নয়, তার একরঙা চরিত্রে ক্ষণিকের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন।

দুর্বলা কূটবুদ্ধি দাসী। সতীনেরা সখীত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে তার লাভ কিছু নেই।

দু-সতিনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে লাগিল তার কালকূট-জ্বালা ॥
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।
পাইট করি মরিব দুজনে দিবে গালি ॥
যেই ঘরে দু সতিনে না হয় কন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে .ড় পাগল ॥
একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥

তাই লহনার দুষ্টবুদ্ধিকে নানা যুক্তিতে সে জাগিয়ে তুলেছে। আবার বিজিত ক্লান্ত খুল্লনার মুখে জল যুগিয়েছে।

ধনপতি দেশে ফিরতে সে দ্রুত খুল্লনার নিকটবর্তী হল। বাজার হাটে কিছু পয়সা চুরি এবং মিথ্যে হিসেবের ছলনা অবশ্য সমানে চলছিল।

কিন্তু হাতে তালি দিয়ে কৃষ্ণগান গেয়ে বালক শ্রীপতিকে সে নাচিয়েছে হারানো সন্তানের সন্ধানে বেপথু মাতার সে সাহচর্য করেছে। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অনাড়ম্বর এই সংবাদ-কণিকা দুটি পরিবারের এই বৃদ্ধা দাসীর বাৎসল্য-সিক্ত হৃদয়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত ক'রে তার চরিত্রকে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে॥